৪৩বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
পুরনো সংখ্যা থেকে		২
স্মারক বক্তৃতা	অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়	৩
দশাবতার ব্যাখ্যা	অনু: আশীষ লাহিড়ী	৭
ভালো নেই ভাই	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	১০
মহাপ্লাবনের পর	তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী	১৫
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সমীরকুমার ঘোষ	১৮
স্বচিকিৎসা (৯)	গৌতম মিস্ত্রী	২১
অথ সাক্ষরতা কথা	সুব্রত গোমেশ	২৪
প্রযুক্তি নির্ভরতা	ভূপতি চক্রবর্তী	২৭
হোমিওপ্যাথি গবেষণা	সুব্রত রায়	৩০
তামার বালা	প্রবীর ব্যানার্জী	৩৪
অনলাইন পঠন-পাঠন	শ্রীময়ী ঘোষ	৩৫
আর্থিক উন্নয়ন ও হাট	শুভঙ্কর রায়	৩৮
পুস্তক পর্যালোচনা	ভবানীপ্রসাদ সাহু	৪০

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল : utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক : http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

গত ১৯ নভেম্বর ২০২২ মহাবোধি সোসাইটি সভাঘরে দ্বাদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা হয়ে গেল। বক্তা অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় 'বিজ্ঞান ও কুসংস্কার— দুই-ই যখন মুনাফা উৎপাদনের কাঁচামাল' বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখলেন। 'কোরক'-এর কাবেরী রায় ও মেধা জানা দুটি গান গেয়ে সেদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বক্তা অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়কে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন উৎস মানুষের শুভানুধ্যায়ী লেখক ও প্রাবন্ধিক আশীষ লাহিড়ী। স্মারক বক্তৃতাটি এই সংখ্যাতে থাকছে। খুব অল্প সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতি অনেকের মতো আমাদেরও ভাবিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন 'প্রচারে খামতি ছিল' — এ ব্যাপারে আমাদের ফেসবুক, দৈনিক সংবাদপত্র, আকাশবাণী ও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের ওপর কিছুটা নির্ভর করতেই হয়। ঘটনা হল অনেকেই লাইক দেন, উপস্থিত থাকবেন বলে জানান কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন তাদের দেখা যায় না। আমাদের সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা তাও বোধহয় এর অন্যতম কারণ। স্মারক বক্তৃতার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বটিও বেশ জমে ওঠে। পূরবী ঘোষ, অরুণ পাল, সুব্রত গোমেজ, ডাক্তার অপরেশ ব্যানার্জী, স্বপ্নময় চক্রবর্তীদের করা প্রশ্নগুলি ও বক্তার উত্তর শ্রোতাদের বাড়তি পাওনা বলেই ধরা যায়।

সম্প্রতি বেনারস-এর আদলে কলকাতায় 'গঙ্গারতি'র প্রস্তুতি চলেছে। ঘাট বাছাই হচ্ছে। পরিবেশবিদরা দূষিত নদীর-র দূষণ আর না বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন।কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে পরিবেশবিদদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে না।

ইমেইল থাকতে পোস্টকার্ডে চিঠি পাঠানোর কথা তোলাটা হাস্যকর মনে হতে পারে। ডাকবাক্স হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায়। পাঠকদের চিঠি নিবন্ধের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইদানীং তা আর আসে না। প্রিয় পাঠক, পত্রিকার লেখা নিয়ে সংক্ষিপ্ত চিঠি দিন। পত্রিকার ইমেইলেই তা পাঠাতে পারেন।

আসন্ন কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় উৎস মানুষ-এর স্টল থাকবে। সেখানে আমরা পাঠকদের মুখোমুখি হবার অপেক্ষায় থাকব। — **পরিচালকমণ্ডলী** উমা

মানুষ (উৎস মানুষ) পত্রিকার পুরনো সংখ্যা থেকে (৪)

কেমন ছিল সংখ্যাগুলি? তারই কিছু নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস মূলত নতুন পাঠকদের কথা ভেবে। প্রথম বছরে (১৯৮০) প্রতিমাসে একটি করে বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হত, প্রথম পর্বে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ও বিনিময় মূল্য থাকত যথাক্রমে ১৮ এবং ০.৭৫ টাকা। প্রথম বছরে পত্রিকার 'মানুষ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পত্রিকা 'উৎস মানুষ' নামকরণ করা হয়। পাঠকদের অনুরোধে সেপ্টেম্বর (১৯৮০) মাস থেকে পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০ করা হয়। এবং পত্রিকার বিনিময় মূল্য ধার্য করা হয় এক টাকা। বাৎসরিক ১২ টাকা। সম্পাদনায় ছিলেন ঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং প্রদীপ দত্ত।

মানুষ প্রথম বর্ষ অক্টোবর সংখ্যা ঃ এই সংখ্যায় মূল আকর্ষণ ছিল অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ রচনা ন্যাবার মালার রহস্য উন্মোচন—'মালা বাড়ে রোগ সারে', যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জন্ডিস রোগের উপশমে অন্ধবিশ্বাস। রচনাটির অংশবিশেষ—''যে প্রথম শুনবে সেই আশ্চর্য্য হবে। ছোট্ট একটি মালা। রোগীর গলায় পরিয়ে দিলে মালা বাড়তে থাকে। এক দেড় দিনে গলা ছাড়িয়ে বুকে নেমে আসে। ...কি করে হয়? শহর গ্রামে হাজারো মানুষের বিশ্বাস—রোগের বিষ শুষে নিয়ে বড় হয় মালা, তাতেই রোগী রোগমুক্ত হয় ...রোগটির নাম ন্যাবা বা কামলা (কান্তিকে মলিন করে তাই কামলা)।... ন্যাবার মালা কোনো শাস্ত্রসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি নয়, একান্তই টোটকা চিকিৎসা।'' রচনাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, পরে ছোট পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। রচনাটি এখন পাওয়া যাবে উৎস মানুষের প্রকাশনার 'বিজ্ঞান,অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান' বইটিতে।

এই সংখ্যার আহরণ বিভাগে বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার রচনা—'সবই ব্যাদে আছে', যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ২৭ বর্ষ, ফাধন ১৩৪৬ (ইং ১৯৪০) সংখ্যার ৪০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর লিখেছিলেন 'মা দুর্গার আদি ও অন্ত'—যেখানে উনি বলেছেন 'আদিতে ছিল দুর্গ, অন্তে হয়ে গেলো দুর্গা'। অন্যান্য লেখা—'ভোলেবাবা ও তাঁর ভৃত্য অনুচররা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ধারাবাহিক লেখা প্রথম পর্ব —'নিরস্ত্রীকরণের এক দশকঃ প্রতিশ্রুতি ও পরিণতি'—সৌমিত্র শ্রীমানী এবং নিয়মিত লেখা 'উৎসপুরুষ' ও 'সাপ নিয়ে কিংবদন্তী'।

মানুষ প্রথম বর্ষ নভেম্বর সংখ্যা, ১৯৮০ ঃ বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় শেষ বয়সে মানুষ পত্রিকার পাঠকের জন্যে লেখা 'বিশ্বের অন্তিম মৌলিক উপাদান' সেই সময়ে যথেষ্ট চর্চার বিষয় ছিল। লেখাটির মুখবন্ধে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন —''বাংলার বিজ্ঞানাকাশের অন্যতম জ্যোতিষ্ক সমাজসচেতন রসায়নবিদ প্রিয়দারঞ্জন সেই তিরিশ দশক থেকে তাঁর গঠনমূলক চিন্তা ও কর্মধারাকে সঁপে দিয়েছিলেন নির্ভেজাল বিজ্ঞান সাধনায়। আজ বয়স তাঁকে বেঁধে ফেলেছে শয্যায় কিন্তু মনীষার দীপ্তস্রোতকে স্তব্ধ করতে পারেনি। নব্বুই পার করেছেন অনেকদিন। আজও তাঁর মুক্ত মন সৃষ্টি রহস্যের অন্ধি সন্ধি খুঁজে ফেরে। শেষ বয়সের এই রচনাটি তিনি 'মানুষ'-এর পাঠকদের জন্যে পাঠিয়েছেন। ... এই প্রবন্ধের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও অভিমত একান্তই লেখকের নিজস্ব। 'মানুষ' পত্রিকার আদর্শগত ভিত্তির (বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ) সঙ্গে এর সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিষয়াদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।'' অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখা—বারমুডা ত্রিকোণের রহস্যভেদ এবং সাপের ভাব ভালোবাসা রাগ প্রতিহিংসা।

মানুষ প্রথম বর্ষ ডিসেম্বর ১৯৮০ সংখ্যায় আহরণ বিভাগে প্রকাশিত হয়— 'বিজ্ঞান কংগ্রেসের কেলেঙ্কারি', লেখার মুখবন্ধের কিছু অংশ—''সাইন্স কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন বসেছিল বোম্বাইতে, ১৯৬০ সালের ৩ থেকে ৯ই জানুয়ারী। সভার উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহেরু। এই অধিবেশনের অভিজ্ঞতা দুঃসাহসিক সততার সাথে পর্যালোচনা করে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন সমাজসচেতন মানবদরদি বিজ্ঞানী জন স্যান্ডারসন হ্যালডেন।'' অন্যান্য লেখার সূচি : যে মানুষটি অলৌকিকতা ও ধর্মীয় ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়েছেন—'অলৌকিকতা, অপজ্ঞান বনাম আব্রাহাম টি কভুর', ধারাবাহিক রচনা ঃ সাপ নিয়ে কিংবদন্তি—'কালনগিনীর কামড়', 'নিরস্ত্রীকরণের এক দশকঃ প্রতিশ্রুতি ও পরিণতি' ও উপন্যাস 'উৎসপুরুষ'। এখানে উল্লেখ করার বিষয় হল, 'কালনাগিনীর কামড়'-এর মূল লেখক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখেছিলেন। এরকম অনেক লেখাই পাওয়া যাবে উৎস মানুষের পাতায় যেগুলি ছদ্মনামে লিখেছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

উমা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বাদশ স্মারক বক্তৃতা ২০২২

বিজ্ঞান আর কুসংস্কার দুই-ই যখন মুনাফা উৎপাদনের কাঁচামাল

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

উৎস মানুষ এবং অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আমার যোগাযোগ হয়েছিল কাজের মাধ্যমে। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো মানুষ একালে তো বটেই, কিন্তু সেকালেও যে এরকম মানুষ অজস্র ছিলেন সেরকম তো বলতে পারি না। একেবারে প্রাণের তাগিদ থেকে, একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যান যাঁরা— চারপাশে যা ঘটছে তার মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের অবিজ্ঞানের চর্চা বাড়ছে, তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, লড়াইটা জারি রাখতে হবে, তাতে কত লোকের মন বদলানো যাবে সেটা পরের কথা। কিন্তু লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে — অশোকবাবু ছিলেন সেই গোত্রের মানুষ। এই লড়াইয়ের প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আমার একাধিক বার কথা হয়েছে, উৎস মানুষ-এর বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে। আমরা অনেকেই প্রথম থেকেই হতাশার কথা দিয়ে শুরু করি— এটা করে কিছু হবে না, কি আর হবে এ-সব করে, ইত্যাদি। এটা অশোকবাবুর মধ্যে দেখিনি। ওঁর কথায় এই চিন্তাটাই লক্ষ্য করতাম যে— কাজটা করতে হবে।

যে ভাবনা থেকে ১৯৮০ সালে উৎস মানুষ শুরু হয়েছিল

তার প্রথম কথাটা ছিল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে বিজ্ঞানকে সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান সেখানে এক অর্থে গৌণ। সেখানে প্রধান কথা হচ্ছে বিজ্ঞান চেতনা। বিজ্ঞান যেভাবে আমাদের ভাবতে শেখায় সেই চিন্তাপদ্ধতিটা কীভাবে আমরা সমাজের মনে সঞ্চারিত করতে পারব। কুসংস্কার যে কুসংস্কার সেটা মানুষকে বোঝানোর জন্য এখান থেকেই ভাবনাটা শুরু করা দরকার। উৎস মানুষ তার চেষ্টাই করেছে, করে চলেছে।

আমাদের শিক্ষার মধ্যে— কেবল স্কুল-কলেজের শিক্ষা

নয়, পাঠ্যবই পড়া নয়—আমাদের প্রতিদিনের যে শিক্ষার প্রক্রিয়া, তার মধ্যেই এই চেষ্টা জারি রাখা দরকার। সেটা ১৯৮০ সালে যতটা সত্য ছিল, আজও ততটাই সত্য, বস্তুত তার থেকে অনেক বেশি সত্য। এই 'অনেক বেশি সত্য' কথাটা বলার পেছনে একটা বিশেষ কারণ আছে। ১৯৮০ থেকে চার দশক পার হয়ে গেছে। অর্থনীতির অগ্রগতি যেভাবে মাপা হয় (অবশ্য সেই নিয়ে সমস্যার শেষ নেই, কিন্তু আপাতত সে-প্রশ্ন থাকুক) সেই অনুসারে দেখলে এই চার দশকে আমাদের দেশের অর্থনীতির অগ্রগতি অনেকটা হয়েছে। এর পাশাপাশি, কতকগুলো সামগ্রিক মাপকাঠিতে— যেমন, সাক্ষরতার হার, স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুপাত (ড্রপ আউট-এর মাত্রা যদিও এখনও ভয়াবহ), কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও তার বৈচিত্র — তা হলে এ-কথা বলা ভুল নয় যে, নানাদিক থেকে আমাদের শিক্ষার অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

এখন, এই যে শিক্ষার প্রসার, এর ফলে তো এমনটাই হওয়ার কথা ছিল যে, কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান, অবিদ্যা — এই সমস্যাগুলোর একটা সংকোচন ঘটবে; এক অর্থে হয়ত কমেছে এটাও ঠিক। এক ধরনের কুসংস্কারের প্রতিপত্তি আগে ছিল, এখন আর ততটা প্রতিপত্তি নেই। যেমন ধরা যাক, ভূতের ভয়। ভেবে দেখলে ব্যাপারটা বেশ চোখে পড়ে— যত শহর বেড়েছে, অন্ধকারের জায়গায় আলো এসেছে, ভূতের উপদ্রব ততটা কমেছে কারণ ভূত — অন্তত আমাদের চেনাজানা ভূতেরা— অন্ধকার ছাড়া থাকতে পারে না। এখন তো আর, শহরের কথা ছেড়ে দিলাম, গ্রামেও, ভূতের বাড়ি থাকা মুশকিল। কারণ ভূতেদের তো থাকতে হবে, বসবাস করতে হবে, তার ব্যবস্থাই নেই আর। কুসংস্কারের ক্ষেত্রেও কিছুটা তাই। অনেক রকমের কুসংস্কার আছে যেটা আর আগের ফর্ম-এ থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু এবার যদি প্রশ্ন করা হয়, কুসংস্কার কি আমাদের কমে গেছে? আমরা কি এ ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারি? আমার মনে হয়, একেবারেই পারি না। প্রথমত কুসংস্কারের নানা চেহারা দেখা দিয়েছে; দ্বিতীয়ত কুসংস্কারের পুরনো চেহারাগুলো নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। একটা সহজ উদাহরণ— ভূত হয়ত আমাদের চারাপশে কমে গেছে, কিন্তু ভূতের গল্প, হরর স্টোরি, ভূত নিয়ে চলচ্চিত্র, নাটক, সিরিয়াল— বিভিন্ন বিনোদনের মধ্যে এখন অহরহ ভূতের আবির্ভাব এবং সেটাকে বহু মানুষ বেশ 'স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য' বলেই মনে করেন— যেন 'এমনটা তো হতেই পারে!' এই সব ভূতেরা খুবই সফল হচ্ছে, জনপ্রিয় হচ্ছে। 'মিথ্যে ভেলকি ভূতের হাঁচি' হয়তো সত্য হয়ে ওঠেনি, কিন্তু অনেকের কাছেই তারা 'উত্তর-সত্য' হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। এবং, পোস্ট-ট্রুথ মিথ্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর, কারণ সত্যিমিথ্যের সীমারেখাটাকেই সে ঝাপসা করে দেয়। সেই কারণেই বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে মিথ্যের সঙ্গে লড়াই করা তুলনায় সহজ, উত্তরসত্যকে কেবল সেই চেতনা দিয়ে হারানো মুশকিল, কারণ তা ওই চেতনার কাঠামোটাকেই নড়বড়ে করে তোলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা দরকার, আর একটা ব্যাপার আমাদের চারপাশে ভয়ানকভাবে ঘটছে। সেটা হল, আমাদের জীবনের কোনো কিছুই আর বাজারের বাইরে থাকছে না। আমেরিকান দার্শনিক মাইকেল স্যান্ডেল-এর মতো কেউ কেউ 'মার্কেট সোসাইটি'র কথা বলেছেন— সমাজটাই যখন বাজারের পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। আমরা ইতিমধ্যেই তেমন এক বাজারগ্রস্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত, ঘুম থেকে উঠে রাতে শুতে যাওয়া অব্দি বাজারের বাইরে থাকতে পারি না। যেমন হাতে বা পকেটে রাখা মোবাইল টেলিফোনটি নিজেই আজ একটা অনন্ত বাজার। এবার, বাজারের ব্যাপারটা যদি আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে ঢুকে যায় সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কুসংস্কার দুটোই সেই বাজারের উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। এবং তার পরিণামে, যে দুটো জিনিস পরস্পরবিরোধী বলেই জেনে এসেছি, তাদের মধ্যে যেন একটা একটা সাদৃশ্যের ধারণা তৈরি হয়, অনেক কুসংস্কারকেই তখন বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়। বাজার যে আমাদের চেতনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, এটাও তারই একটা দৃষ্টান্ত।

এই সমস্যাটার ভেতরে ঢোকার আগে দুটো ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। এক, সব কিছুই অর্থনীতি দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে, এমন কোনও কথা আমরা বলতে চাইছি না। কেবল এটুকুই বলতে চাইছি যে আমাদের চেতনার গতিপ্রকৃতির পিছনে অর্থনীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কথাটা এই কারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের চারপাশে নির্ধারণবাদী মার্ক্সবাদের যে ধারণা প্রায় একচ্ছত্র রাজত্ব করে এসেছে, তা কেবল ভ্রান্ত নয়, প্রবলভাবে বিভ্রান্তিকর। কিন্তু 'বেস' বা ভিত্তি এবং 'সুপারস্ট্রাকচার' বা উপরিকাঠামো সেই বাঁধা ছকে না দেখলেও চেতনার নির্মাণে অর্থনীতির প্রভাব অভিনব কিছু নয়। অর্থনীতির বিজ্ঞান এবং কুসংস্কার, উভয়কেই আগেও ব্যবহার করছে। তার বহু উদাহরণ

আমরা জানি। বস্তুত, সেই অভিজ্ঞতা থেকে অসামান্য সাহিত্য তৈরি হয়েছে। যেমন, শিবরাম চক্রবর্তীর সেই বিখ্যাত কাহিনী, যেখানে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা পাথরের টুকরো থেকে দেবতা জন্মাচ্ছে বাজারের টানে। সেটা আমাদের এখনকার চেনা বাজার নয়, কিন্তু তার পেছনেও একটা মুনাফা তুলে নেবার পরিকল্পনা আছে। সুতরাং কুসংস্কার আর বাজারের সম্পর্ক নতুন নয়।

কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সেই সম্পর্কটা যেখানে পৌঁছেছে, মুনাফাসন্ধানী পুঁজি যেভাবে কুসংস্কারকে ব্যবহার করছে, সেটা অনেকাংশেই নতুন। আমাদের যে পুরনো ধরনের কুসংস্কার ছিল সেগুলো অনেকটাই বাজার নিজের প্রয়োজনে এবং নিজের সুবিধেমত সংশোধন করে নিচ্ছে, পরিমার্জন করে নিচ্ছে এবং কাজে লাগাচ্ছে। যেমন ধরা যাক জ্যোতিষের কথা, যা উৎসমানুষ-এর আলোচনায় বরাবরই একটি বড় বিষয়। আশি-নব্বইয়ের দশকে আমাদের রাজ্যে বেশ কিছু সংগঠন এবং পত্রপত্রিকা জ্যোতিষ এবং এই ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। জ্যোতিষ সেদিনও বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু এখন যেভাবে বাজার জ্যোতিষকে ব্যবহার করে এবং জ্যোতিষের কারবারিরাও বাজারকে ব্যবহার করে--- তাতে এই অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের চেহারাটাও পাল্টে গেছে। আগে জ্যোতিষকে আমরা যে চেহারায় দেখতাম, সে এখন তার থেকে অনেক বেশি 'আধুনিক', 'উন্নত', 'প্রযুক্তিসজ্জিত', এককথায় 'সফিস্টিকেটেড'। তার কারবারের প্রসারের জন্য নানারকমের কৌশল ও প্রকরণ তৈরি হয়েছে। এখন অলঙ্কারের দোকান এবং গ্রহ রত্নের ব্যবসা এক ছাদের তলায় বাস করে। আগে কিন্তু এটা বড় আকারে ছিল না— গয়নার দোকানে গয়না বিক্রি হত, জ্যোতিষীরা তাদের জায়গায় বসে ব্যবসা করত। তার পর একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে, দেখা গেল রাজযোটক সম্পর্কের কল্যাণে দোকানেরও ব্যবসা বাড়ে, জ্যোতিষীরও। এবং এর পাশাপাশি, আজকে ডিজিট্যাল প্রযুক্তিকে আধুনিকতার সর্বোচ্চ স্তর বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, একটা ছোট যন্ত্রের মধ্যে যে ডিজিটাল দুনিয়াকে ভরে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও জ্যোতিষ ভয়ঙ্করভাবে ঢুকে রয়েছে। এই ভাবেই জ্যোতিষ-ব্যবসার নানারকমের প্রকরণ আমাদের মগজে ঢুকে গেছে। আমরা ভাবতে শুরু করছি, এগুলো যেন বৈজ্ঞানিক, যুক্তিসম্মত। একদিকে কম্পিউটারে ঠিকুজি, কোষ্ঠী, ভাগ্যগণনা করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে জ্যোতিষ এখন ঠিকুজি, কোষ্ঠী ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নেই, অক্ষর গুনে নাম দেওয়া বা নামের বানান বদলে দেওয়া থেকে শুরু করে 'বাস্তু'র নিয়ম মেনে বাড়ি তৈরি করা বা কেনা— জ্যোতিষের বিশ্বরূপ দর্শন করে চলেছি প্রতিনিয়ত। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অনেক কুসংস্কারকেই মানুষ এখন আর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির থেকে আলাদা করতে পারছেন না।

আবার উল্টোটাও সত্যি। বাজারের লীলায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকেও অনেক সময়েই কুসংস্কার থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। এখানেই একটা নতুন কুসংস্কারের কথায় আসা যেতে পারে। চিকিৎসা, রোগনির্ণয়, স্বাস্থ্যপরীক্ষা এই সব নিয়েও জমে উঠেছে বিরাট ব্যবসা। আগেও এই ব্যবসা ছিল। যেসব ডাক্তার বেশি ওষুধ দিতেন এবং বেশি টেস্ট করতে দিতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলা হত ওষুধ ব্যবসার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। কিন্তু আজ এটা অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে। রাস্তায় যেতে যেতে দেখা যায় বড় বড় বিজ্ঞাপন— আপনার কি বুক ধড়ফড় করে, আপনি কি রাতে বারবার ওঠেন, তাহলে কিন্তু একটা মেডিক্যাল টেস্ট করিয়ে নিন। এই যে ক্রমাগত পরীক্ষা করার হার এটা গত দশ-পনেরো বছরে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। আজকাল মাঝে মাঝেই দেখা যায় বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্প হচ্ছে, তার আয়োজন করছে কোনও বেসরকারি চিকিৎসা সংস্থা অথবা এমন কোনও 'সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা', যারা আসলে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি। এই আয়োজনগুলিকে ব্যবহার করে কী করে মুনাফা বাড়ানো যায় তার একটা বিশাল ছক তৈরি হয়ে গেছে এবং সেটাকে উত্তরোত্তর প্রবল উদ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা তো বিনা কারণে হয়নি, এর পিছনে কাজ করছে ব্যবসা বৃদ্ধির সুচিন্তিত হিসেবনিকেশ, অর্থাৎ 'বিজনেস মডেল'। মনে রাখা দরকার যে পরীক্ষা করালে অনেকেরই কিছু না কিছু রোগ ধরা পড়বে, বিশেষ করে বয়স্কদের। রোগ ধরা পড়লেই পরীক্ষকরা পরামর্শ দেবেন—আপনি অমু হাসপাতালে যান, অমুক ডাক্তারের কাছে যান। চিকিৎসা ব্যবসার প্রসার ঘটবে।

লক্ষ্য করা দরকার, এই গোটা ব্যবস্থাটা রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ভিত্তিতেই তৈরি। একে সরাসরি 'অবৈজ্ঞানিক' বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আর তার ফলেই এই ব্যবস্থাটির প্রভাবে মানুষের মনে স্বাস্থ্য নিয়ে একটা নাছোড় উদ্বেগ তৈরি হয়। সেই উদ্বেগকেও 'ভিত্তিহীন' বলবার উপায় নেই—কেউ তো নিশ্চয়তা দিতে পারবে না

যে কোনও রোগের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং স্বাস্থ্য নিয়ে এই উদ্বেগ দূর করা কার্যত অসম্ভব। তার ফলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাবোধের তীব্র অভাবে ভোগেন। এই মানসিকতাই বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মুনাফার এক প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'বেসরকারি' কথাটা এখানে বারবার বলা হচ্ছে, কারণ সরকারি হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে মুনাফা বাড়ানোটাই প্রধান বা অন্তত একমাত্র লক্ষ্য নয়। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসাকে পুঁজি এবং নিজের ব্যবসার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থই দাঁড়ায় এই যে, মুনাফাটা অন্যান্য ব্যবসার মতো বাড়িয়ে যেতে হবে। এরই পরিণাম হল, বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের একটা লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে দেওয়া যে—এই ব্যবসাটা আনতে হবে। আনার উপায় হল মানুষের কাছ থেকেই টাকা জোগাড় করতে হবে।কী তার উপায়? প্রধান উপায় হল আমাদের স্বাস্থ্য-চিন্তা। যে নিজের স্বাস্থ্য যত খারাপ বলে ভাবব তত বেশি মুনাফা হবে। এইভাবে একটা শৃঙ্খল তৈরি করে দেওয়া হল। আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থা এবং রোগ নির্ণয়ের যে গোটা কাঠামো, সেটা শুধু মুনাফার সন্ধান করতে শুরু করল তা না, কী করে মুনাফা বাড়ানো যায় তার নিরন্তর চেষ্টা চলতে লাগল। এবং আমরা এই ব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক মনে করতে অভ্যস্ত হলাম। ভাবতে শুরু করলাম যে চিকিৎসা তো এভাবেই করতে হবে। এইভাবেই তৈরি হল নতুন কুসংস্কার। চিকিৎসা ব্যবস্থা তার একটা নজিরমাত্র। চারপাশে এমন নজির আরও বিস্তর ছড়িয়ে আছে।

কুসংস্কার যেমন পুঁজির প্রকরণ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, পুঁজির স্বার্থেই যেভাবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নতুন কুসংস্কার তৈরি করা হচ্ছে, তেমনই বিজ্ঞানশিক্ষাও সেই স্বার্থের কবলে পড়েছে। আগে ধারণা ছিল বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলে, বিজ্ঞানচর্চা করলে বৈজ্ঞানিক চেতনা উন্নত হবে। আজকে কি সেটা বলা যায়? আজকের বিজ্ঞানশিক্ষা স্কুল-কলেজের পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বিজ্ঞানচেতনার বিকাশ নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। এটা সামগ্রিকভাবেই শিক্ষার সমকালীন চরিত্রের সঙ্গে জড়িত। এখন শিক্ষা মানে কেবলমাত্র নম্বর তোলা। এটা নতুন নয়, কিন্তু আজ শিক্ষা ব্যাপারটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—শিক্ষাকে কেবলমাত্র কেরিয়ারের উপায় বলে মনে করা হচ্ছে, এটা এক অর্থে নতুন। এটাও একটা কাঠামো, একই সঙ্গে জীবনের কাঠামো এবং চিন্তার কাঠামো। এই কাঠামোটাকে তৈরি করছে পুঁজি আর তার নিয়মে চালিত বাজার। এই কাঠামোর প্রসার যত ঘটবে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াই তত কঠিন হবে। একেবারে শৈশব থেকে শিক্ষার্থীদের যদি ক্রমাগত বলা হয়—চাকরির জন্য, উপার্জন করার জন্য শিক্ষা দরকার, তাহলে তার কাছে বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রভৃতির আর কোনও গুরুত্ব থাকে না। ব্যবহারিক সুবিধেটাই একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই আজকের বাস্তবতা। এই বাস্তব নির্মিত হচ্ছে বাজারের নিজের স্বার্থে। ফলে এর সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। আগেকার মতো বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার ঘটলেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে, এটুকু বলে আর কিছু করা যাবে না।

শেষে একটা বুনিয়াদি কথা বলা দরকার। 'সংস্কার' মানে যা আমাদের মনের অভ্যাস হয়ে উঠেছে, সেই অভ্যাসের বশে যাকে আমরা প্রশ্ন না করেই মেনে নিতে শিখেছি। সংস্কারটাকে সংস্কার বলে চেনানোর জন্য প্রশ্ন করা জরুরি। প্রশ্ন করার জন্য উৎপাদন, ব্যবসা, অর্থনীতি, পুঁজি—এই সমগ্র ধারণাটা নিয়ে আলোচনা জরুরি। আজ যেহেতু কুসংস্কারের ধারণাগুলো বাজার দখল করে নিচ্ছে এবং সেটাকে ব্যবহার করছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলেও বাজারকে বাদ দিয়ে লড়াই করা যাবে না। যতভাবে সম্ভব, বাজার তথা পুঁজির খেলাটা নিয়ে কথা বলতে হবে। শুধু 'কুসংস্কার খারাপ', এটা বললে হবে না।

বক্তা কর্তৃক সম্পাদিত গত ১৯ নভেম্বর ২০২২-এ দ্বাদশ 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়' স্মারক বক্তৃতা। উমা

দশাবতার ব্যাখ্যা

জোতীরাও ফুলে

অনুবাদ ঃ আশীষ লাহিড়ী

পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর থেকে

ধোন্দিবা ঃ এ থেকে প্রমাণ হয় যে বিপ্র ইতিহাসবিদরা এই ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল যে এই জঘন্য পাপকর্মের দরুন জনগণ যদি ওর নিন্দে করে, তাহলে তো ওর সুনামের হানি ঘটবে; তাই তারা হরেক মিথ্যা কাহিনি বানিয়ে তুলল— যেমন, ও নাকি জন্মেছিল একখানা স্তম্ভর ভেতর থেকে ইত্যাদি, আর সেইসব গালগল্পকে তথাকথিত ঐতিহাসিক বিবরণগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

জোতীরাও ঃ একদম তাই। কারণ, যদি আমরা মেনে নিই যে ও সত্যিই জন্মেছিল একখানা স্তম্ভর মধ্য থেকে, তাহলে প্রশ্নঃ কে ওর নাড়ি কাটল, কে ওকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মুখে তুলোর সলতে করে দুধ তুলে দিল? আর, কোনো একজন শুশ্রূষাকারিণীর বুকের দুধ না খেয়ে কিংবা কেউ দুধ না খাওয়ালে ও বেড়েই-বা উঠল কী করে? এইসব গল্প আমরা সত্যি বলে মেনে নিতে পারি না, কারণ এগুলো প্রকৃতির নিয়মবিরোধী। এইসব ধাপ্পাবাজ ইতিহাসবিদরা ওকে একেবারে পূর্ণ-পরিণত অবস্থায় একটা স্তম্ভর মধ্য থেকে টেনে বার করে এনেও ক্ষান্ত হল না, ওর মুখে ঘন গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে দিল আর ওকে এমন ভয়ানক শক্তিশালী করে তুলল যে জন্মানো মাত্রই ও কিনা হিরণ্যকশ্যপুকে কোলের ওপর টেনে এনে জান্তব নখ দিয়ে তার পেট চিরে ফেলল! হায় রে, যে নাকি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবতার সে একজন দয়ালু পিতাকে এমনিভাবে সাজা দিতে পারল, একেবারে জানে মেরে দিল, যে-পিতা এক বিপথগামী পুত্রকে সত্যি সত্যিই অন্তর থেকে ভালোবেসে নিজের বিশ্বাসের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করছিলেন। নিতান্ত অজ্ঞ এক সাধারণ সত্তার অবতারও কি কখনো এমনভাবে শাস্তি দিতে পারত! তাছাড়া, সে তো আদিনারায়ণের অবতার, তার কি উচিত ছিল না হিরণ্যকশ্যপুর সামনে অবতীর্ণ হবার সময় নিজের আসল পরিচয় নিশ্চিত করে জানিয়ে পুত্রর সঙ্গে পিতার মিটমাট করিয়ে দেওয়া? সেসবের ধারকাছ দিয়ে না গিয়ে সে স্রেফ হিরণ্যকশ্যপুকে খুন করে দিল! কী ভয়ানক কাণ্ড! আর যদি ধরে নিই, সে যে সত্যিই ঈশ্বরের অবতার, হিরণ্যকশ্যপুকে সেটা বোঝানোর সাধ্য তার ছিল না, তাহলে কী করে সে দাবি করে যে সে-ই সকলকে বুদ্ধিমত্তা প্রদান করেছে? এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই নরসিংহর বুদ্ধিসুদ্ধি আমাদের এই পুণে শহরেরই এক নীচ বিষ্ঠাপ্রেমী বেশ্যার চেয়েও কম। ওই বেশ্যা যে কীভাবে এক 'পণ্ডিত'কে, যে নিজেকে বলে বৃহস্পতি, তাকে পাকড়ে মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কার্যত নিজের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে, সে খবর নিশ্চয়ই তুমি রাখো। ইদানীং বেশ কয়েকজন মার্কিন আর ইউরোপীয় মিশনারি ভারতীয় তরুণদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিচ্ছে; কিন্তু ধর্মান্তরিতদের মধ্যে একজনও কি নিজের পিতাকে হত্যা করেছে? ব্যাপারটা আশ্চর্যের নয় কি?

ধোন্দিবা ঃ নরসিংহ যখন এইভাবে এক হাসির পাত্রে পরিণত হল, তখন বিপ্ররা কি কোনোভাবে প্রহ্লাদের রাজ্য জিতে নেবার চেষ্টা করেছিল?

জোতীরাও ঃ বিপ্ররা লুকিয়েচুরিয়ে বেশ কয়েকবার সে-চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কোনোবারই কিছু করে উঠতে পারেনি। কারণ প্রহ্লাদ তখন বুঝে গিয়েছিলেন, বিপ্ররা তাঁকে ঠকিয়েছে। ওদের আসল উদ্দেশ্য কী, সেটা প্রহ্লাদ তখন উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ওদের আর এতটুকুও বিশ্বাস করতেন না, যদিও সবার সঙ্গেই ওপর-ওপর সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন, ভালোভাবে নিজের রাজ্যর দেখভাল করতেন। প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিরোচন তাঁর শাসনকে আরও শক্তপোক্ত করে তোলেন। বিরোচনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বলি সিংহাসনে বসেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় মনের সাহসী যোদ্ধা হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। প্রথমেই বিভিন্ন ঝামেলা-পাকানো লোকেদের হয়রানির হাত থেকে ছোটোখাটো সর্দারদের উদ্ধার করে নিজের অধীনে নিয়ে আসেন। তারপর নিজের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে শুরু করেন। সেসময় বিপ্রদের সর্দার ছিল বামন। লোকটা লোভী, বেপরোয়া আর একগুঁয়ে। বলিরাজের ক্ষমতাবৃদ্ধির ব্যাপারটা তার মোটেই পছন্দ হল না, কাজেই তলায় তলায় অনেক সেনা সংগ্রহ করে রাজ্য দখলের জন্য সে বলিরাজের সীমানার দিকে এগোল।

ষষ্ঠভাগ

বলিরাজ, জোতীবা, মরাঠা, খণ্ডোবা, মহাশুভ, নৌ খান্দাঞ্চা ন্যায়ী, ভৈরোবা, সাত আশ্রয়িত, থালি ভরণে, পবিত্র রবিবার, বামন, পক্ষ গলনে, বিন্ধবালী, ঘট বসবীন, সতীপ্রথা, আরাধী, শিলাঙ্গন, ধান্যদানার বলি, বলির দ্বিতীয় পুত্রর আবির্ভাবের দৈববাণী, বাণাসুর, কুজাগিরি, বামনের মৃত্যু, উপাধ্যে, হোলি, বীর পূজাবিধি, বলি প্রতিপদ, ভৌবীজ প্রভৃতি।[১]

ধোন্দিবা ঃ তখন বলি কী করলেন?

জোতীরাওঃ তিনি তৎক্ষণাৎ তার অধীন যত অভিজাত শাসক আর সর্দার ছিল সবার কাছে উটের পিঠে চাপিয়ে দূত পাঠালেন। কড়া হুকুম দিলেন, তারা যেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে অবিলম্বে সীমান্তর দিকে রওনা হয়ে যায়।

ধোন্দিবা ঃ কত দূর অবধি বিস্তৃত ছিল বলির রাজ্য?

জোতীরাও ঃ বহুদূর অবধি। ধরে নিতে পারি দেশের নানা অংশে তার অধীনে বেশ কিছু এলাকা ছিল। এছাড়া সিংহলদ্বীপের কাছেও তার অধীনে বেশ কয়েকটা দ্বীপ ছিল; কারণ আজও পর্যন্ত সেখানে বলি নামে একটা দ্বীপ আছে। কোলাপুরের দক্ষিণে কোঙ্কন অঞ্চল আর মাওয়াল অঞ্চলের কিছু কিছু অংশও তার রাজত্বর অধীন ছিল। মহারাষ্ট্রর উত্তরে রত্নগিরি নামে এক পাহাড়ে তিনি থাকতেন। তাঁর রাজ্যর দক্ষিণে একটা অঞ্চলেরও নাম ছিল মহারাষ্ট্র। মরাঠা কথাটা খুব সম্ভব এই মূল শব্দেরই অপভ্রংশ। মহারাষ্ট্র যেহেতু এক বিশাল অঞ্চল, তাই বলি তাকে নয়টি খণ্ডে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। প্রতিটি খণ্ডের একজন করে প্রধান থাকত, তাকে বলা হত খণ্ডোবা। মর্যাদা অনুযায়ী এদের নীচে থাকত দুজন করে সহকারী, তাদের বলা হত মাল্লুখান। জেজুরির খণ্ডোবা ছিল এই রকম এক কর্মকর্তা। প্রতিবেশী সর্দারদের রাজসভার বিভিন্ন মল্লযোদ্ধার বিদ্রোহ দমন করে তাদের কাণ্ডজ্ঞান ফেরানো ছিল এর কাজ। সেইজন্য তাকে মল্লারি-ও [= মল্ল+অরি] বলা হত। আজকের দিনে মলহারি নামে যার পূজা প্রচলিত সে হয়তো এই মল্লারি শব্দটিরই অপভ্রংশ। ন্যায়যুদ্ধর জন্য তার খুব নামডাক ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক কোনো যোদ্ধাকে কখনো সে পিছন থেকে আক্রমণ করত না। সেইজন্য তার নাম ছিল মার্তোণ্ডা [তোণ্ডা= মুখ]।[২] মার্তণ্ড শব্দটা এরই অপভ্রংশ। এই মল্লারি আবার নিপীড়িতদেরও ত্রাতা। একই সঙ্গে সংগীতের বোদ্ধা। তার তৈরি মল্লার নামে একটি রাগ তো আজও প্রসিদ্ধ। মিঞা নামে একজন বিখ্যাত মুসলিম গায়ক এই আদি মল্লার রাগের ধাঁচেই মিঞা কি মল্লার নামে এক নতুন রাগ সৃষ্টি করেন। বলিরাজা খাজনা আদায়ের জন্য এবং ন্যায়বিচারের জন্য আরও দুজন কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। এদের বলা হত মহাশুভ আর নৌ খণ্ডাঞ্চা ন্যায়ী। তাদের সাহায্য করবার জন্য আবার কয়েকজন করে অধস্তন কর্মকর্তা থাকত। কালে এই মহাশুভ কথাটাই মনে হয় বদলে গিয়ে মাসোবা-য় পরিণত হয়েছে, যে-শব্দটা আমরা আজ ব্যবহার করি। এর কাজ ছিল কৃষকদের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ যাচাই করে সেই অনুযায়ী খাজনা স্থির করা কিংবা মকুব করা। আজও পর্যন্ত প্রতিটি মরাঠি পরিবার তাদের খামারের এক কোণে এই মহাশুভর নামে একটি প্রস্তরখণ্ড বসিয়ে তাতে সিঁদুর লেপে দেয়। তার সামনে ধূপ না জ্বালিয়ে তাকে পুজো না করে বীজ বপন, আগাছা নিড়ানো, ফসল তোলা প্রভৃতি খেতের কোনো কাজই শুরু করে না। মুসলমানরাও মনে হয় খাজনা আদায়ের এই পন্থাই অবলম্বন করে। খুব সম্ভব তারা বলিরাজার কাছ থেকেই এটা শিখে নিয়েছিল। কেননা সেযুগে মুসলমানরা তো বটেই,

এমনকী মিশর থেকেও বিদ্বানরা সে-রাজ্যে লেখাপড়া করতে আসতেন। এ ছাড়া কাশী অঞ্চলের অযোধ্যার কাছে বলিরাজার অধীন কিছু এলাকা ছিল, সেগুলিকে বলা হত দশম বিভাগ আর সেখানকার প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হত কালভৈরী।[৩] কিছুকালের জন্য সে বোধহয় কাশীরও কোতোয়াল ছিল। সংগীতে সে এত দক্ষ ছিল যে ভৈরব নামে এক রাগ রচনা করেছিল। এতই কঠিন সে-রাগ যে তানসেনের মতো বিখ্যাত গায়কদেরও সে-রাগ গাইবার আগে দুবার ভাবতে হত। দাউর নামে এক নতুন বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করেছিল এই কালভৈরী। এতই জটিল তার গড়ন যে তবলা কিংবা মৃদঙ্গর মতো যন্ত্র থেকেও অত সুমধুর স্বর নির্গত হত না। তবে যতটা খ্যাতি সে-যন্ত্রের প্রাপ্য ছিল তা সে পায়নি, বহুলাংশে অনাদৃতই রয়ে গেছে। কালভৈরীর ভৃত্যর নাম ছিল ভৈরেওয়াড়ি, আজকের দিনের 'ভারাড়ি' তারই অপভ্রংশ। এই বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বলিরাজার রাজ্য বহুদূর প্রসারিত ছিল। অজপল অথবা দশরথের রাজ্যর চেয়ে তা ঢের বড়ো ছিল। আর সেই কারণেই চারপশের যত সর্দার সব বলিরাজার নীতিই অনুসরণ করত। সেই জন্যই বলিরাজাকে বলা হত 'সাত আশ্রয়িত' — যিনি সাতজনকে রক্ষা করেন। মোট কথা, তাঁর রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল বলেই মনে হয়। পুরোনো একটা প্রবচন আছে ঃ 'বলিরাজা তোমার কানের পাশে ঘুষি মেরে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে'। কোনো অমাত্যকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে নিয়োগ করার আগে তিনি রাজসভা বসিয়ে একখানা থালার ওপর কিছু পানপাতা আর একটা নারকেল আর কিছুটা হলুদ রেখে ঘোষণা করতেন, ওই পানপাতা একমাত্র সেই অমাত্যই তুলতে পারবে যার ওই কাজ সমাধা করার হিম্মৎ আছে। তাই শুনে যে-অমাত্যর সত্যি সত্যিই সেই ক্ষমতা আছে সে এগিয়ে এসে 'হরহর মহাবীর' বলে হুংকার দিয়ে নারকেল আর পানপাতাগুলো তুলে নিত; তারপর নমস্কার জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে নিজের কপালে সেই হলুদ বাটা লেপে দিয়ে সেই থালার যাবতীয় উপাদানগুলি মাথায় ঠেকিয়ে সবটুকু নিজের আঁচলে ভরে নিত। তখন বলিরাজা সেই বিশেষ অমাত্যটিকে নির্দিষ্ট কাজের ভার অর্পণ করতেন। সে তখন নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে শত্রুকে পরাজিত করার উদ্দেশে রওনা দিত। খুব সম্ভব সেই কারণেই এই আচার অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'থালি তোলা'। তবে বলিরাজার মহা মহা যোদ্ধাদের মধ্যে ভৈরোবা আর জোতীবা, এবং সেই সঙ্গে ন-জন খণ্ডোবা-ই প্রজাদের সুখী করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। সেইজন্যই মরাঠারা বরাবরই কোনো পবিত্র অনুষ্ঠানের আগে 'থালি তোলা'র আচার পালন করে আসছে। ভৈরোবা, জোতীবা আর খণ্ডোবা তাদের কাছে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা পেতে শুরু করল এবং থালি তোলার প্রাচীন আচার পালনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। মরাঠীরা 'হরহর মহাদেব', 'জোতীবাচা চাং ভালা', 'সদানন্দের উত্থান জিন্দাবাদ', 'গর্বময় মাল্লুকান জিন্দাবাদ' এই সব ধ্বনি উচ্চারণ করে। বলিরাজা যেহেতু রবিবারকে প্রভু শিবের পবিত্র দিন বলে গণ্য করতেন, তাই আজকের দিনেও মাং, মাহার, কুনবি, মালী এবং অন্যান্য মরাঠিরা প্রতি রবিবার গৃহদেবতাকে পূজা না দিয়ে অন্নজল গ্রহণ করে না। সবার আগে দেবমূর্তিকে স্নান করানো হয়, তারপর বাড়িতে যা-খাবার আছে তাই দিয়েই তাঁকে নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

ধোন্দিবা ঃ বলিরাজ্যর সীমান্তে পৌঁছে বামন কী করল?

জোতীবা ঃ বামন তার সর্বশক্তি নিয়ে বলিরাজ্যর ভেতরে ঢুকে পড়ল। পথে প্রজাদের হয়রান করতে করতে তারা রাজধানীর কাছে পৌঁছে গেল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্যসামন্ত এসে না-পৌঁছনো সত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে বলিরাজকে তখনই হানাদারদের সঙ্গে লড়াইয়ের নামতে হল। তাঁর লড়াইয়ের কৌশল ছিল এইরকম — ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রথমা তিথিতে যুদ্ধ শুরু করে একেবারে পঞ্চদশী তিথি অবধি টানা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। ঊষাকালে যুদ্ধ শুরু করতেন, সন্ধেবেলা প্রাসাদে ফিরে বিশ্রাম নিতেন। সেইজন্যই ওই কৃষ্ণপক্ষের কোন কোন তারিখে উভয় দলের কতজন করে সৈন্য মারা গেছে তা মনে রাখা সহজ। সম্ভবত সেই কারণেই ভাদ্রপদ মাসের[৪] প্রথম পক্ষে পিতৃপক্ষ বা পক্ষ উদ্‌যাপনের রীতির উদ্ভব হয়েছে। **(চলবে)**

১। নৌ খান্দাঞ্চা ন্যায়ী — নয়টি বিভাগযুক্ত বিচার বিভাগ; সাত আশ্রয়িত - সুরক্ষিত সাতজন; থালি ভরণে - দাসখত; পক্ষ ঘালানে - অন্ত্যেষ্টির আচারবিধি; ঘট বসাভিন - পবিত্র ঘট; আরাধী - উপাসক; শিলাঙ্গন - সীমানা পার হওয়ার আচরণবিধি; কুজাগিরি - কোজাগরী।

২। অর্থাৎ যে সবসময় সম্মুখ থেকে মারে। তোণ্ডা = মুখ।

৩। কালভৈরব

৪। শ্রাবণমাস।

উমা

ভালো নেই ভাই

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সখী ভালো থাকা কারে কয়? — খুব জটিল প্রশ্ন। 'ভালো থাকা' একটা ধারণা মাত্র। নেংটিপরা বা না পরা জারোয়ারা বিনা বিদ্যুতে বিনা কলের জলে সমস্তরকমের আধুনিকতাহীন আদিমতায় ভালোই আছে। ওদের কাছে যেহেতু তুলনা করার দৃষ্টান্ত নেই, অন্যরকমের বেঁচে থাকার খবর খুব একটা জানে না ওরা, তাই 'কেমন আছ?'র উত্তর একটাই, কিম্বা উত্তর নেই। কেমন আছ আবার কেমন প্রশ্ন হল? থাকাটা এইরকমই, একই রকম। বাঁচাটা তো একই রকম। ব্যক্তিগতভাবে কেউ হয়ত অসুখ-বিসুখ-এ ভুগতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ভালোই তো আছে। পাহাড়ের গুহায় থাকা সাধুরাও সুখী। আগে রাস্তায় প্রচুর পাগলদের ঘুরতে দেখতাম। এখন ততটা দেখি না। কেশো পাগলা নামে একজন ছিল, প্রবল কাশতো। হাড় জিরজিরে চেহারা। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, কেমন আছ কেশো? ও বলত ফাস্টো কেলাস।

কারোর সঙ্গে দেখা হলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর আসে 'ভালো'। ভালো বললেই ব্যাপারটা মিটে যায়। যদি কেউ বলে—না, ভালো নেই, তাহলে ভালো না থাকার ব্যাখ্যা দিতে হয়। 'কেমন আছো' প্রশ্নটা সাধারণত শারীরিক কুশল থাকাটাকে নিয়েই হয়। যাঁরা বলেন — না, ভালো নেই, তখন অবধারিত পরবর্তী প্রশ্ন—কেন? কি হল! তখন বলতে হয়, প্রেশার কমে গেছে, সুগার বেড়েছে, কোমরে ব্যথা ইত্যাদি। নইলে কেন ভালো নেই-এর উত্তরে স্ত্রী বা ঘনিষ্ঠ কারোর শারীরিক সমস্যা বা বিয়োগের কথা আসে। ভালো না থাকার অন্যতম কারণ যে সামাজিক রোগ, সমাজ-শরীরের অসুখ, সাধারণত এ নিয়ে কোনো কথা 'কেমন আছেন'-এর জবাবে দিই না।

অভিনেতা সত্য ব্যানার্জীর কথা মনে পড়ে। কেমন আছেন-এর উত্তরে বলতেন, শরীর ভালো, কিন্তু খুব খারাপ আছি।

সত্য ব্যানার্জী প্রয়াত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। এই কয়েক বছরে দেশের জি ডি পি বেড়েছে, কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বেড়েছে। আর আমাদের খুব খারাপ থাকার মাত্রাও বেড়েছে। আগেই বলেছিলাম ভালো থাকা একটা অনুভবের নাম। একটা ধারণা। ভালো থাকাকে মিটার-গ্রাম-মাইক্রন দিয়ে মাপা যায় না। আর এই অনুভবটি তেমন স্থিরও নয়। কলকাতায় যখন 'ভালো নেই, ভালো নেই' ভাব, ডুয়ার্সে গিয়ে মনে হল এই বেশ ভালো আছি। কিন্তু এমনও তো হয়, রাত্তিরের ঝিঁঝিঁর ডাকের মধ্যে নিশির ডাক শুনি। কেমন হতাশা আর বেদনার শব্দে মনে হয় ভালো নেই, একেবারে ভালো নেই। এই দু-দিনের ডুয়ার্স তো দাঁতের ব্যথা কমাবার ওষুধ, দুঘণ্টা পরেই ব্যথা শুরু হবে। কারণটা একা একা ভালো থাকা যায় না। সকালে পেট পরিষ্কার হওয়া আর রাতে ঘুম হওয়াটাই ভালো থাকা যায় না। এটা একার ভালো থাকা। আমরা একা একা কাঁদি, কিন্তু একা হাসতে ভালোবাসিনা। যে কারণে আজকের দিনে আমরা সমাজ-মাধ্যমে যা শেয়ার করি, ফরোয়ার্ড করি, তা হল হাসি। হাসির উপাদান এবং মজা আনে এমন কিছু। আসলে আমাদের মজা ভাগ করে নিতে চাই, তেমনি ভালো থাকাটা প্রকৃত প্রস্তাবে একার ভালো থাকা নয়। সমবেত ভালো থাকা।

ভালো থাকা, সুখে থাকা নিয়ে অনেক কথা-প্রবচন-ছড়া ঘুরে বেড়ায় আমাদের সমাজে। যেমন 'ধনে সুখ নাই, মনে সুখ।' 'ইমান কা বাচ্চা হ্যায় খুশ', 'কিলাইয়া সুখ আনন যায় না', আবার ব্যক্তিগত ভোগ লালসা জনিত সুখকেও জনমনন ভালোভাবে নেয় নি। একটা প্রবাদ মনে পড়ছে, 'শান্তিপুরে রসের সাগর এক এক ঘরে তিন তিন নাগর'। সুখে থাকা সম্পর্কিত কথা উঠলে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বকরূপী যক্ষের কথোপকথনটা চলে আসে। যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা ছিল সুখী কে? যুধিষ্টির উত্তরে বলেছিলেন, অখসনী, অপ্রবাসী যে লোক নিজের ঘরে শাক-ভাত খায়, সেই সুখী। এটা এখন আমরা এই ভুবনগ্রামে এটা মানতে পারি না এ সময়ে দাঁড়িয়ে। বরং সুখের বা ভালো থাকার যে সংজ্ঞাটা অমর্ত্য সেন দিয়েছিলেন, সেটাই এখন প্রায় সর্বত্র গ্রাহ্য। সুখ মানে সমষ্টিগত আনন্দদায়ক অবস্থা।

সেটাই দেখি এবার। আমাদের সমষ্টিগত আনন্দ কতটা আছে। আমাদের বলতে আমাদের দেশের আরও ছোট করে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি। এই মুহূর্তে একটা বাহনবাণী মনে পড়ে গেল। লরি বা বাসের পিছনে লেখা থাকে— সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে। ঢাকা শহরের এক রিকসার পিছনে দেখেছিলাম—সুখ স্বপনে শান্তি কবরে। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্বপ্নে যে সুখ দেখেন সেটা কেমন? উনি বলেছিলেন, ওটা বেহেস্তি সুখ। সেখানে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং দিয়া হুইয়া থাকো, রিক্সা চালাওন নাই হালায়, দরদস্তুর নাই। ঘাম নাই, পশিনা নাই, বিলাইতি মদ ভালো ভালো চাখনা... আমি বলেছিলাম কেন এতগুলি সুন্দরী হুর ... হুর দিয়া করুম কী! বহুত ঝামেলা। আমি হপনে হুর-মুর দেখি না, ক্যাল দেখি, হুইয়া আছি। আর তপন রায়চৌধুরীর বাঙালনামায় পড়েছিলাম একটি সংলাপ, ''রাণী ভিক্টোরিয়ার কি সুখ কও দেহি, আচ্ছা কইরা মরিচ দিয়া পান্তা খাইয়া এতক্ষণে উব্বুত।'' আবার একটি গ্রাম্য ছড়ায় শুনি— 'একা সুখের পাখনা আটা, বেবাক সুখের পাখনা কাটা।' রূপকথায় সুখপাখি নামে একটা ধারণা আছে। সুখপাখি আসে, আবার উড়েও পালায়। কিন্তু সবার মধ্যে যখন সুখ বিরাজ করে তখন সেই সুখ স্থায়ী হয়। সুখপাখির ডানা কাটা পড়ে তখন।

সামাজিক সুখ নির্ভর করে একটা সুস্থ সামাজিক অবস্থার ওপর। যখন রয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাস, বিধিসম্মত দেয়া নেয়া, নৈতিক বোধ, সহমর্মিতা, ভাগ করে নেয়ার প্রবণতা— সেটা সমৃদ্ধি বা দৈন্য যাই হোক না কেন। একটা সমবেত ঈর্ষা, কাউকে কষ্ট দেব না, অন্যের অসুবিধার কারণ হব না এমন একটা মনোভাব আমাদের একটা আনন্দদায়ক অনুভূতি দেয়। আমাদের এইসব কিছুই এখন কমছে। দিনে দিনে ক্ষয় হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর ৭৫ বছর কেটে গেল। হৈ-হৈ ট্যাঁড়া। হিসেব দেখাবে এত বিলিয়ন অমুক হয়েছে, এত বিলিয়ন তমুক হয়েছে...।

হ্যাঁ। এখন প্রায় সবাই ইচ্ছে করলে জামা গায়ে দিতে পারে। পায়ে চটি গলাতে পারে। দুটো নুনভাতও খেতে পারে। মানে, না মরে বেঁচে থাকতে পারে। সে তো অ্যামিবাও পারে। তবে অ্যামিবার সুখবোধ নেই, মানুষের আছে। মানুষের সুখবোধ কেবলমাত্র পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির মধ্যে আটকে নেই। যিশুখ্রিস্ট সেই কবেই বলেছিলেন, 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন।'

যখন এই নিবন্ধটি লিখছি, তখন, মানে এখন আমার বয়স সত্তর। গত ষাট বছরের স্মৃতি আমার ধরা আছে। স্মৃতি সতত সুখের এই কথাটা কিছুতো সত্যি বটেই। ফেলে আসা দিনগুলি বারেবারে পিছু ডাকে। সেই দারিদ্র্যমাখা দিনগুলির গুলি খেলা, বন্ধুদের সঙ্গে জল জমা রাস্তায় কাগজের নৌকো ভাসানো, একটা হাঁসের ডিমের অর্দ্ধেকের মধ্যে জেগে ওঠা কুসুম-উল্লাস, মণিমেলা-আনন্দমেলা-স্বপনবুড়ো-মৌমাছি -চল কোদাল চালাই ...। তারপর স্বপনকুমার-অরণ্যদেব-পেনের লিক সারানো-সোভিয়েত দেশ-হরিপদ ভারতী-হীরেন মুখার্জি-হরেকৃষ্ণ কোনার...। এইভাবে বেড়ে ওঠা।

একটা গান আছে— 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম'। ওটায় নস্টালজিয়াটিক সুখ আছে কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। আগে আমাদের অসুখ ছিল না তা নয়। নানা অভিযোগ ছিল, নানা ক্ষোভ ছিল। কিন্তু আশেপাশে এমন কিছু মানুষ ছিলেন যাঁদের দেখে আনত হতে পারতাম। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ছিল। মনে হত এঁর মতো হব বড় হলে। আমাদের এক আত্মীয় ছিলেন, খদ্দর পরতেন, অধ্যাপনা করতেন, 'স্বদেশী' ছিলেন। সবাই সম্মান করতাম। একজন আত্মীয় ছিলেন কম্যুনিস্ট কর্মী। সবাই সম্মান করতাম। এক আত্মীয় ছিলেন, ঘুষের চাকরি তাঁর। খুব ঠাঁটবাট ছিল। আমার পিতামহ তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, 'ঘুষের টাকায় এইসব দেখনদারি কইরো না।' ট্রামের টিকিট ফাঁকি দিয়েছিলাম, একজন বয়সে বড় যাত্রী বলেছিলেন—চলো তোমাদের বাড়ি চলো। তোমার বাবাকে বলে দেব। স্কুলে টুকলি ধরা পড়লে পরীক্ষা বাতিল শুধু নয়, অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হত।

টোকাটুকির প্লাবন এল ৭০-৭৩। এরপর কিছুটা কমেছিল। আবার জোয়ার এলো ২০১০-এর পর থেকে। ডাক্তার পিতা, তিনি আবার ডাক্তার সংগঠনের নেতা, নিজের সন্তান যেন ভালোভাবে টুকে পরীক্ষা দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করলেন। ছাত্রনেতাদের টাকা দিয়ে দিলে নির্বিঘ্নে টোকা যায় এমন ব্যবস্থাও হল। তারপর তো শিক্ষকের চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা দিয়েও শিক্ষকের চাকরি পেয়ে গেছে এমন অনেক দৃষ্টান্তও এখন প্রকাশিত। বিনিময়ে দিতে হয়েছে প্রচুর টাকা।

ভালো আছি কি নেই— এরও একটা শ্রেণীভেদ আছে। আমি যখন গ্রামের গভীরে চাকরি করেছি, ওখানে কেমন আছেন কাকা প্রশ্নের উত্তরে এক প্রবীণ জোতদারের কাছে শুনেছি — ভালো থাকার কি জো আছে ভাইপো? কোরা

বাগদির ছেলেগুলান ইস্কুল যাচ্ছে, বাগাল পাওয়া দায়। তার উপরে শুনছি নাকি বর্গাদার রেকর্ডিং হবে, ওদের নাকি তাড়ানো যাবে না। কোনও বর্গাচাষীকে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বলতেন—আগের চেয়ে ভালো আছি স্যার।

একবার ১৯৯২ সাল নাগাদ ওড়িশার কেন্দুঝার এলাকায় রেডিওর চাকরির সূত্রে গিয়ে ঠিক করেছিলাম গ্রামীণ কৃষি মজুরদের কিভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে তুলে ধরব। সরকারি দৈনিক মজুরির চেয়ে ওদের অনেক কম দেয়া হয়। সেটা ওদের দিয়ে বলাব। আমি ডি এম সাহেবকে আগেই ফোনে বলেছিলাম অনুষ্ঠানটা শুনবেন স্যার।

এক ওড়িয়া সহকর্মীর সঙ্গে একটা গ্রামে গিয়ে এক কৃষি শ্রমিককে ধরলাম। ওকে বলতে বললাম—আমি কত কম পাই। শুনেছি সরকারি নীতি অনুযায়ী মজুরি এত, কিন্তু পাই এত। এতে আমার চলে না। আমার সহকর্মী ওদের ভাষায় যতটা সম্ভব বুঝিয়েছিল কী বলতে হবে।

উল্টে সে আমাদেরই বলল—মালিক এত দেবে কি করে? চাষে লাভ আছে? এতজন মজুর খাটে। যদি মজুরিতেই মালিকের টাকা চলে যায়, তবে মালিক কি পাবে? তা ছাড়া মালিক পান্তা দেয়, মুড়ি দেয়। বোঝানোর চেষ্টা করি—কিন্তু সরকার বলেছে কম করে এত টাকা দিতে হবে। যদি আপনারা সবাই বলেন, তাহলে মালিক দিতে বাধ্য।

অনেক বোঝানোর পর শেষ অব্দি শেখানো বুলি ওকে দিয়ে বলানো যায়। কিন্তু যে উপসংহারে এই সাক্ষাৎকার শেষ হল, ওখানে বলল— 'বহুত ভলা অছি আইজ্ঞা, রঢ়িয়া চালুচি। গোটে টংকা চা-বিড়ি গুলগলা, দুই টংকা বজার, দুই টংকা চাউল, গোটে টংকা হাড়িয়া, ব্যাস, সরি গেলা। আউ কেড়ে? মানে সে ভালো আছে, দিব্য আছে। এক টাকার চা-বিড়ি, টিফিন (বিকেলের) দু টাকা চাল, দু টাকা বাজার, এক টাকা হাড়িয়ার জন্য খরচ। আর ও তো দু টাকা বাড়তি থাকে। আর কি চাই?

ভালো থাকা না থাকার যে বোধ তার একটা বড় কারণ বৈষম্য পর্যবেক্ষণ এবং সেই পর্যবেক্ষণে কষ্ট পাওয়া।

এই কৃষি শ্রমিকটি বৈষম্য দেখছে বটে, কিন্তু এতে কষ্ট পাচ্ছে না। কারণ এই বৈষম্যও স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে। ওর বাপ দাদা গরীব ছিল, ও নিজেও গরীব। গরীব থাকাই ওর নিয়তি। আর মাইতিবাবু, মহাপাত্রবাবুদের ধনী থাকাই নিয়তি, এরকমটাই ভেবে নিয়েছে সে। এই ভাবনাটাই অসুখী করে না তেমন। যদি 'নিয়তি' নামক ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করি— যা হবার সবই পূর্ব নির্দিষ্ট। এই দুর্দশা, মানুষে মানুষের এই তফাৎ সবই বিধির বিধান বা কর্মফল। যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য টাকা দিতে হচ্ছে, যে কোনো কাজের জন্য ঘুষ দিতে হচ্ছে, কোনো প্রকল্প থেকে সুবিধা নেবার জন্য কমিশন দিতে হচ্ছে, চিকিৎসকদের অনেকেই যতটা পারছে রোগীদের সঙ্গে স্রেফ ব্যবসা করছে, নার্সিং হোমগুলো, বেসরকারি স্কুলগুলো বিচ্ছিরি রকম টাকা লুটছে, সরকারের কোনো হেলদোল নেই, প্রতারকরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের কেউ কেউ ভোটে দাঁড়াচ্ছে এবং জিতেও যাচ্ছে। প্রমাণিত খারাপ মানুষগুলোও ভোটে জিতে যাচ্ছে। এই সব কিছুকে অনেকেই যেন ভাবছেন এমন তো হবারই কথা ছিল, কিম্বা যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, কিম্বা এসব কেয়ামতের আলামত। কেয়ামত আসবার অগে কি কি হবে কোরানে বলা আছে। এসব তারই অঙ্গ। কিম্বা শেষে এমনটাই হবার কথা। এভাবে ভাবলে ততটা মন খারাপ না-ও হতে পারে। কিন্তু মন খারাপ হয় আমাদের মতো মানুষদের। যারা নিয়তি, কেয়ামত, অদৃষ্ট, কর্মফল ইত্যাদি বিশ্বাস করি না। আমরাই গত বেশ কয়েক বছরের ক্রমবর্দ্ধমান কুনীতি, কুকর্ম, কু-শাসন দেখে দেখে, আর কিছু করতে না পারার বেদনায় মন খারাপে ভুগি। কেবল মনে হয় আমরা ভালো নেই।

কিন্তু গণমানস নামে একটা কথা আছে। সমষ্টির সমবেত ইচ্ছা। ধর্ম-অদৃষ্ট, নিয়তি ইত্যাদির দোহাই দিয়ে দিয়ে উটপাখির মতো মরুঝড়ে বালিতে মুখ ডুবিয়ে, কিম্বা চোখ বুঁজে কোকিলের দিকে ফিরিয়ে রাখতে পারি না। ঘোষ বোস চ্যাটার্জি ব্যানার্জিদের সঙ্গে মৃধা-সাপুই-লোধা-বারুইদেরও মন খারাপ হয়। যে যার মতো করে বিষাদ ও শূন্যতায় ভোগেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা বলি। চাত্রজীবন থেকেই সমাজবিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছি। নেতাদের কথায় বিশ্বাসও করেছি। ১৯৬৭ সালের কিশোরবেলায় কংগ্রেস হেরে যাবার পর আমাদের বাবা-কাকাদের মতো ভেবেছি এবার ভালো দিন আসবে। তারপর দেয়াল লিখনে দেখেছি ভোটের পথে হবে না, বিপ্লব চাই। এবং কি ভাবে বিপ্লব হবে তার একটা রূপরেখাও পেয়েছিলাম হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা এবং কয়েকটি পত্রপত্রিকায়। বিশ্বাস করিনি দৃঢ়ভাবে—যে এভাবেই ভালো দিন আসবে। আসেনি। প্রচুর মৃত্যু দেখেছি। বামফ্রন্ট সরকার এল। ভালো দিন দেখব ভেবেছি। বেশ কিছু ভালো কাজ দেখেছি। মন ভালো হওয়ার মতো ঘটনাও কিছু। কিন্তু আবার মন খারাপ হতে শুরু করল। নতুন সরকার এলো। অল্পদিনের

মধ্যেই ওরা এমন সব কাজকর্ম শুরু করল যে মন খারাপ হতে লাগলো। কিছু প্রকল্প খুব মনোমুগ্ধকর। অনেকেরই মন ভালো হবার কথা। কিন্তু সেই প্রকল্পগুলির সুবিধা পেতে হলে টাকা দিতে হয়, বশ্য হতে হয়— ইত্যাদি ব্যাপারগুলি অনেকেই মেনে নিল। একটা নতুন দাস সমাজ তৈরি হল। দুর্নীতি এবং দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দাতাদের সমাজ তৈরি হল, এবং ''একশ টাকা পেতে গেলে দশ, বিশ টাকা তো খরচা করতে হবেই'' —এই সরলীকরণ মানুষ মেনেই নিল, বা মেনে নিতে বাধ্য হলো। যারা এসব মানতে পারল না, মন খারাপটা তাদের।

সেই কবে থেকে মেনে নিচ্ছি সব। খাবার জিনিসপত্রে রং মেশানো চলছে। রাঙা আলু উচ্ছে পটলে বিষাক্ত রং মেশাচ্ছে। বাজার কমিটি চুপ। স্থানীয় প্রশাসন চুপ। সেই কবে থেকে জিলিপি বোঁদে দরবেশ অমৃতিতে, আজকাল বিরিয়ানিতে বিষাক্ত রং দেয়া হচ্ছে, সবাই চুপ।

জ্যোতিষ চ্যানেলগুলিতে জ্যোতিষীরা নানাবিধ প্রতারণা করছে। সবাই চুপ। গাদা গাদা চিট ফান্ড লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে গেল। কারোর সাজা হল না আজও। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কের মতো সুখী দেশগুলোতে এসব ভাবাই যায় না। এমন কি আমেরিকার মতো দেশেও এসব ভাবা যায় না। কথায় কথায় রাস্তা অবরোধ কোথাও হয় না। প্রকাশ্য রাস্তায় বড় বড় জন্তু জবাই এবং রক্তপাঁকের বীভৎস দৃশ্য আমাদের দেশ ছাড়া আর দু-একটি দেশে হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় মুরগি কাটার মতো দৃশ্যদূষণ, জঘন্য রকমের শব্দদূষণ কোথায় হয়? যারা বিদেশে গিয়েছি, দেখেছি ওদের নাগরিক সমাজ ও প্রশাসন, তাদেরই মন খারাপ হয় বেশি, কারণ তুলনা করতে পারি।

গত দশ-বারো বছরে আর্থিক দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সামাজিক আস্থা নামে যে ধারণাটি সমাজে থাকে, সেটাকেই টলিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মানুষের যে আস্থা গড়ে উঠেছিল সেটা হ্রাস পেলে ফল হয় মারাত্মক। যদি সরকারি স্কুলের প্রতি, সরকারি হাসপাতালের প্রতি, স্থানীয় প্রশাসন যেমন---থানা, বিজিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিসগুলোর উপর বিশ্বাস হারায়, একজন মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী প্রতিযোগিতায় বসতে চাইবে না, ভাববে শুধু উত্তীর্ণ হলেই চাকরি হয় না। টাকা দিতে হয়। ছাত্ররা শুরু থেকেই ভাববে টুকে পাশ করতে হবে, টাকা খরচ করে পাশ করতে হবে। আবার এটাও ভাবছে পরীক্ষায় পাশ করে কি হবে? সিন্ডিকেট করি, দালালি করি, কোনো নেতার চামচে হয়ে তোলাবাজি করি না কেন? এই ধরনের ছেলেরা তো বেশ গলায় সোনার হার পরে বাইকে গঁকগঁক শব্দ করে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়, গার্লফ্রেন্ড জোটায়।

'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই রবীন্দ্র বাক্যটি যেন 'ধূলায় হয়েছে হারা'। আমরা এখন একে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখি। যে ঠিকভাবে চাকরি পেয়েছে, তাকেও ভাবি ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছে।

চাটুকারদের দেখি, কী অবলীলায় ওরা স্বৈরাচারকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যাকে তাকে ডি লিট দিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্য শিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্য, পরিপুষ্ট করার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানগুলি আছে, ওরা বড় বড় পুরস্কার যাদের দিচ্ছে, তা দেখে ওই সব প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আস্থা চলে যাচ্ছে। যারা এসবের প্রতিবাদ করছে, তাদের শায়েস্তা করার চেষ্টা চলছে। দুর্নীতি, চাটুকারিতা এবং জুলুম-এর একটা ককটেল তৈরি করা হয়েছে।

শিক্ষা ব্যাপারটাই গোল্লায় গেছে। বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলি বহুদিন ধরেই রুগ্ন। মধ্যবিত্ত শুধু নয়, নিম্নবিত্তরা ও ইংলিশ মিডিয়ামে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। আমাদের গৃহ সহায়িকা চার বাড়িতে কাজ করে মাসে বারো হাজার টাাক রোজগার করেন, তাঁর ছেলের ইংলিশ মিডিয়ামেই দু'হাজার টাকা মাইনে দেন। বাংলা মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষকরা সত্যিই শিক্ষিত ছিলেন। শিক্ষাব্রতী ছিলেন অনেকেই। অনেকেই হয়ত আছেন। কিন্তু শহরে ছাত্র নেই। আর শিক্ষক নিয়োগে গত দশ বছরের ব্যাপক দুর্নীতিতে শিক্ষকদের উপর আস্থাই চলে গেছে। যখন তখন, নানা অছিলায় স্কুল বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। মফঃস্বলের স্কুলগুলিতে ছাত্র/ছাত্রী আছে। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকা নেই। একটি জেলা স্কুলের খবর জানি, গত এক বছর ধরে একজনও অঙ্ক শিক্ষক নেই।

শিক্ষা যদি বিপর্যস্ত হয়, আগামী প্রজন্ম পঙ্গুত্বের শিকার হবে। মনীষী বচন আছে— একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হলে মারণাস্ত্র নয়, মারণব্যাধি ছড়িয়ে দেয়া নয়, শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দাও। মানবসম্পদ যদি পঙ্গু হয়ে যায়, আমাদের ভবিষ্যত তাহলে কি করে আলোময় হতে পারে!

কি বেদনাদায়ক ন্যারেটিভ তৈরি হয়ে গেল—দুর্নীতি ছাড়া কোনো কাজই হয় না। দুর্নীতি ফুর্নীতি বলে কিছু নেই। ক্ষমতা থাকলে, সাহস থাকলে তুমিও কর। ঘুষের অন্যবিধ নাম হয়েছে— গ্রীজ মানি, স্পিড মানি ইত্যাদি।

বহুদিন হল কাজের সুযোগ নেই। সেই শিল্পকে কেন্দ্র করে

গড়ে ওঠা অনুসারি শিল্প নেই। ফলে বিরাট বেকার বাহিনী। কিছু করে তো খেতে হবে। তাই তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, দালালি ইত্যাদি। করে খাওয়া নামে একটা শব্দবন্ধ তৈরি হয়েছে এবং সর্বোচ্চ নেতানেত্রীরা জনগণের প্রতি বক্তৃতাতে করে খাওয়া শব্দটা ব্যবহার করেন।

অভাবে স্বভাব নষ্ট একটা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু সেটা এ সময়ে আর ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। যত ধনী, বহু পয়সার মালিকরা দুর্নীতি করে চলেছে। আরও চাই। আরও। এই সব কিছু নিয়েই মন খারাপ থাকে। 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কহ মুখে'— এটাও প্রযোজ্য নয়। আমরা ক্ষেপেও যাচ্ছি না, কিছু বলছিও না। সবই দেখছি এবং সহ্যও করছি।

আজকের খবরের কাগজেই পড়লাম ঝাড়খণ্ডের বর্তমান সরকারকে ভাঙ্গার চেষ্টায় এম এল এ কেনার জন্য লাখ লাখ টাকার নোটসহ গাড়ি ধরা পড়েছে। একটা পুরো শহরে মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ডাইনি সন্দেহে এক মহিলাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। জোর করে এক মুসলমান নাগরিককে হনুমান চালিশা পাঠ করানো হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দল ঘটা করে কালীপুজো করবে তাতে আসবে দিল্লীর মন্ত্রী। এইসব কিছু দেখছি, কিন্তু সহ্য করছি। এই প্রস্তর নীরবতা আমাদের বিষণ্ণ করে। ক্রমাগত কষ্ট দেয়। মন খারাপ করে দেয়। একটা কেমন হাহাকার চামচিকের মতো ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝেই মনে হয় আমরা সবাই কি অটিস্টিক? পারিপার্শ্বিকতায় কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা মনে পড়ল —

মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই,
কেউ তা বোঝে না সকলি গোপন মুখে ছায়া নেই
চোখ খোলা তবু চোখ বুজে আছি কেউ তা দেখেনি
প্রতিদিন কাটে দিন কেটে যায় আশায় আশায় ...।

এই প্রতিক্রিয়াহীনতা, নির্বিকার ভাব, সমবেত ভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা এসবই হল এখনকার অসুখ।

এই অসুখের কারণ হয়ত বোঝা যায়। নানাবিধ কারণের জটিল ব্যাপার আছে। কিন্তু নিস্তারের উপায় কী? আমূল সামাজিক পরিবর্তন, বা বিপ্লব — এটা তো আমাদের ভাবনার কোহিনুর! ভাবা ভালো, কিন্তু এখনই হচ্ছে কই? সম্ভাবনাও নেই। আমাদের সংবিধানে যে ন্যায্য উপায়ের ন্যায্য বন্টনের আভাস ছিল, সেটাকে চচ্চড়ি করে দেয়া হয়েছে। যখন নির্বাচিত সাংসদরা কেনাবেচার সামগ্রী হয়ে গেল তখন থেকেই পতনের শুরু। অন্যায় করার পর শাসকদলে ভিড়ে যেতে পারলেই সেই অন্যায়টাকে সাফাই করে দেয়া হয়।

এরকম অবস্থায় এই বাংলায় দুটো উৎস মানুষ, তিনটি গ্রান্ট না পাওয়া, সরকারি হল না পাওয়া থিয়েটারের দল, পুরস্কার না পাওয়া দুজন সাহিত্যিক আর কয়েকজন অসুস্থ, অর্দ্ধভুক্ত সমাজকর্মী, বিজ্ঞান কর্মী নিজেদের কথা হক কথাগুলি বলে চলেছেন। এক হাজার লিটারের পোকা কিলবিল জলের ট্যাংকিতে এগুলো দু চামচ তিন চামচ ব্লিচিং পাউডার। কতটুকু ক্লোরিন তৈরি হয় তাতে? তবু হয়। দু চামচ যদি দশ চামচ হয়, পোকাসমাজে একটু তো হুটোপুটি হয়। দশ চামচটা যদি বিশ চামচ হয় ... বিশ থেকে পঞ্চাশ ...।

এই তো দেখলাম ইরানে খোমেইনির বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষ। শ্রীলঙ্কায় মানুষেরা সত্যিকারের কাদা লেপে দিয়েছিল ক্ষমতাধর লোকগুলোর মুখে। মানুষকে যতই ভোগাক্রান্ত, লোভী, নীতিহীন তৈরি করার চেষ্টা করা হোক, মানুষের জিনে রয়ে গেছে গোষ্ঠী জীবনের স্মৃতি। একসঙ্গে থাকার স্মৃতি। সাধ্যমতো কাজ এবং প্রয়োজন মতো ভোগ এই সহজ সামাজিকতা। বন্য জীবনের দু লক্ষ বছর তো রয়ে গেছে আমাদের ডি এন এ-র ভিতরে। সমবেতভাবে বাঁচা। সমবেতভাবে, সুন্দরভাবে বাঁচতে গেলে যা-যা করতে হয় আমাদের অন্তর মন, সেটাই বিবেক।

আমাদের সমবেত মন, ইয়ুং যাকে বলেছেন কালেকটিভ আনকনাস তা থেকেই তৈরি হয়েছিল প্রবাদবাক্যগুলি, নীতি গল্পগুলি। এইসব প্রবাদ হারিয়ে যায় নি এখনো। সহজ মানুষের মুখে এখনো ঘোরে—

খল যায় রসাতল
গাও নষ্ট ভেঙ্গে (শঠ লোক) /কুয়া নষ্ট ব্যাঙে
ঠগ চাচার দরবার/কেমনে হইব বিচার?
আগাছা আগে আগে বাড়ে/মরেও আগে আগে
ঢোলের শব্দ পাদে ঢাকে না।
ডুব দিয়া হাসলে গু কিন্তু মাথায় উঠে।

এরকম কতই না। গণচৈতন্য ঠিকই জাগবে। ভরসা রাখি তবুও।

উমা

মহাপ্লাবনের পর ঃ কলকাতা ১৭৩৭

তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী

ফরাসি ঐতিহাসিক ফ্যারনঁ ব্রদেল মেডিটেরেনীয় সভ্যতা নিয়ে যে আকর গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে পৃথিবীর ওই অংশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু এবং সভ্যতা-সৃষ্টির পেছনে তার ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের দেশেও এখন ভৌগোলিক পরিবেশের ভূমিকার গুরুত্ব ইতিহাস গবেষণায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আলোচনায় আমরা কলকাতা তথা হুগলি নদী তীরস্থ সমতলের জলবায়ুর ইতিহাসের অধুনা বিস্মৃত এক নাটকীয় মুহূর্তের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব।

গল্পটা শোনা সুন্দরবনের এক গাইড, অরুণকুমার সরকারের মুখে। অনেকেই জানেন নেতিধোপানি সুন্দরবনের একটি প্রত্যন্ত সীমান্ত-দ্বীপ, যার পর মানুষের জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এই নেতিধোপানিকে ঘিরে আছে অনেক আঞ্চলিক পৌরাণিক কাহিনী, তবে সে এক অন্য প্রসঙ্গ। আমাদের কাছে যে কথা আপাতত প্রাসঙ্গিক অরুণবাবু তার অবতারণা করলেন চোখে দুরবীন লাগিয়ে আমরা যখন নেতিধোপানির নজর-মিনারে উঠলাম—তার পর। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে গিয়ে এক জায়গায় বললেন,—দেখুন, ওদিকটায় চোখে চোখে দূরবীন লাগিয়ে, গাছের ফাঁক দিয়ে একটা পুরনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাচ্ছেন? প্রথমবার শুনে কানকে তো বিশ্বাসই করিনি। সুন্দরবনে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন! বন কেটে বসতের কথা জানা ছিল, তা'বলে বসত বুজিয়ে বন! — এতো টাইম মেশিনে চাপলে হয়! অরুণবাবু মুচকি হেসে বললেন, চলুন, লঞ্চে বসে শুনবেন।

লঞ্চে ফিরে আনুপূর্বিক শুরু করলেন বনবিবি উপাখ্যান, যার নাম 'জহুরনামা'। সে এক দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক গল্প।

'আরে ভাই, ফকির জিগির হৈল নগরে বাজারে
গাজীর নাম ছিন্নি করে হিন্দু-মুসলমান।
আরে সুন্দরবনের বাগা—
যমধূত কাল দুধ ডাইনে আর বাঁয়,
মধ্যখানে রইছে বইসা যম রাজর আর মায়!'

বা

'কাঙ্গালেরও মাতা তুমি বিপদনাশিনী
আমারও দুঃখেরও মাঝে ভরাবে আপনি
বনবিবি গো
ও বনবিবি গো
বনবিবি মাগো তোমার ভরসাতে এলাম
দুধেভাতে থাকবো সুখে সেলাম দিলাম
যেন বাঘে ছুয়ে না
যেন বাঘে ছুয়ে না'

জঙ্গলে যাঁরা মধুশিকারে যান বা খাঁড়িতে যে জেলেরা মাছ ধরতে যান, দিনে-রাতে তাঁদের ভরসা একমাত্র ওই বনবিবি, বনদুর্গা বা বিশালাক্ষী — যে নামেই ডাকুন না কেন তাঁকে। তিনিই 'দক্ষিণ রায়' অর্থাৎ বাঘের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করেন চিরকাল।

তবে এ অব্দি যা বললাম, তাকে বলা যায় 'ধান ভানতে শিবের গীত'। প্রসঙ্গ-ছুট কথা। এবার প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যাক।

এইসব বনবিবির গল্পের টানে এসে পড়ল সুন্দরবনের মনুষ্য বসবাসের ইতিহাস, দুটো পেয়ারা-বাইনের ফাঁকে সেই ইমারতের ভগ্নাবশেষের প্রসঙ্গ। সেই সূত্র ধরে গাইডমশাই টেনে আনলেন ৫০০ বছর আগের এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৃত্তান্ত—এক ভয়ানক তুফানের কথা। সেই দুর্যোগে সুন্দরবনের প্রাচীন জনপথগুলি মুছে যাবার কাহিনী। এবং তার স্থলে আবার গরান, বাইন, হেঁতাল, গর্জন অধ্যুষিত লবণাম্বু অধিকারের পুনর্প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ।

এর আগে কোথায় যেন পেয়েছিলাম অষ্টাদশ শতকে বঙ্গোপসাগরের এক বিধ্বংসী ঝড়ের উল্লেখ। সুন্দরবন নিয়ে অমিতাভ ঘোষের উপন্যাস 'The Hungry Tide'-এ তো বটেই—এছাড়াও অন্য সূত্রে। সেই ঝড়ের ভয়াবহতা বোঝাতে সেখানে বলা হচ্ছে আস্ত একটা জাহাজ সাগরের মোহনা থেকে প্রবল হাওয়া ও স্রোতের ধাক্কায় উড়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল কলকাতার কাছে, ডিঙি উল্টে পড়েছিল বলে জায়গাটার নামই হয়ে গেল 'উল্টোডিঙি'। এই 'অপ্রকৃতিস্থ' ব্যাখ্যা ছাড়াও

অবশ্য 'উল্টোডিঙি' নামের আরো একটা 'সুস্থ' ব্যাখ্যার কথাও পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি, কিন্তু সেই বিষয়ে বাগবিস্তারের ক্ষেত্র এটা নয়।

যাই হোক ফিরে তো এলাম কলকাতায়। শুরু হল নেট-ভজনা, গুগল-সাধনা। 'উইকিপিডিয়া' নামক এক ভগবান বেশ কিছুটা কৌতূহল নিবারণ করলেন।

ঘটনাটি তিনটি নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, 1737 Calcutta cyclone, Hooghly River cyclone of 1737 এবং The Great Bengal cyclone of 1737। এটিকে বঙ্গোপসাগরের সর্বাধিক বিধ্বংসী সাইক্লোনের মধ্যে পরিগণিত করা হয়। এই তুফান উপকূলে আছড়ে পড়েছিল সে বছরের এগারোই অক্টোবর। প্রায় তিন লক্ষাধিক মানুষ নাকি হত। এছাড়া জাহাজডুবি, চাষের ও গৃহপালিত পশুর অভূতপূর্ব ক্ষতি। তবে দুর্ঘটনা নাকি ষোলকলা লাভ করে জলোচ্ছাস ও ভূমিকম্পের ত্র্যহস্পর্শে।

'উইকিপিডিয়া'-কে বড়ো পণ্ডিতেরা যতই গাল পাড়ুন, আমার মতো খুচরো মধুশিকারিদের কাছে তিনি বনবিবি—অগতির গতি। প্রতিটি নিবন্ধের নীচে external links বলে একটা মেনু থাকে। এতে ক্লিক করে আমি আগেও যেমন পেয়েছি এবারও পেয়ে গেলাম বিস্ময়কর খাজানার হদিস।

তার প্রথমটি একটি পত্র। জনৈক ফ্রান্সিস রাসেলের। দুর্যোগের চাক্ষুষ সাক্ষী। তাঁর বিবরণটি সংক্ষেপে বললে এইরকম — এমন ভয়াবহ দৃশ্য ফ্রান্সিস জীবনে এর আগে দেখেননি, এমন কথা শোনেনও নি কখনও। এমন বাজ পড়ছিল আর অঝোর ভারী বৃষ্টি ঝরছিল যে মনে হচ্ছিল বুঝি মাথার ওপর বাড়িটাই ভেঙে পড়বে। ভয়ে নিজের পরিবারকে নিয়ে তিনি উপরতলা থেকে এক তলায় ছুটে মেনে আসেন। তাঁর বাড়িতে শরণার্থী হয়ে এসে ওঠেন কয়েকজন স্বজাতি পড়শি। তাঁদের বাড়ির জানালা-দরজা সব ঝড়ে উড়ে গেছে।

পরদিন সকালে ঝড় থামলে ফ্রান্সিস বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন নদীতে কমবেশি গোটা তিরিশেক জাহাজের মধ্যে একটিমাত্র টিকে। বেশ কয়েকটা ভাঙা, অন্যগুলোর সলিলসমাধি হয়েছে।

গির্জার চুড়ো ভেঙে পড়েছে, বাড়িঘর ধ্বংস, শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছে এর উপর যেন অকাতরে বোমাবর্ষণ হয়েছে। শহরের গাছে ঢাকা সুদৃশ্য রাস্তাঘাট সব নেড়া, ফাঁকা হয়ে গেছে। আগামী বিশ বছরেও তাদের আগের রূপ ফেরানো যাবে না।

এই চিঠিতে কিন্তু ভূমিকম্পের উল্লেখ নেই। আরো কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায় এই দুর্যোগের যেখানে ভূমিকম্পের উল্লেখ নেই। ভূমিকম্পের উল্লেখ প্রথম উঠে আসছে ১৭৩৮-এর জুনে, একটি ফরাসি সাময়িকে (পত্রিকাটি ক্ষেত্রান্তরিত হয়ে একালে প্রকাশনালয় হয়েছে)। সেই 'ম্যারক্যুর দ্য ফ্রঁস' জানাচ্ছে ঃ ''ফিলিবের বলে একটি জাহাজের মারফৎ পাওয়া একটি খবর মেতাবেক যে খবর ফ্রান্স থেকে আমরা আগেই পেয়েছিলাম তা এবার সুনিশ্চিত হল। বাংলা প্রদেশে গঙ্গার জলোচ্ছাসে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারের পর একটি জাহাজের মাঝিমাল্লা প্যারিসে এসে পৌঁছেছে। তাদের থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে ১০ থেকে ১১ অক্টোবর রাতে উদ্দাম এক ঝড় ওঠে, সঙ্গে দফায় দফায় ভূকম্পন। সমুদ্রে জলোচ্ছাস দেখা দেয় ও নদীর জল দুপাশের সমতলে ভাসিয়ে দেয়। বেশকিছু জনপদ ও গ্রাম জলের নীচে চলে যায়। আন্দাজ লক্ষাধিক মানুষ এর ফলে প্রাণ হারায়। বঙ্গোপসাগরে ভাসমান বহু জাহাজের সলিলসমাধি হয়। কিছু জাহাজ চড়ায় আটকে না গিয়ে, স্রোত ও হাওয়ার তোড়ে ভেসে স্থলভূমির ভেতর অব্দি ঢুকে আসে (লেখার সূচনায় উল্টোডিঙ্গির উল্লেখটি স্মর্তব্য)। জল সরে গেলে শুকনো জমির উপর জাহাজগুলি পড়ে থাকতে দেখা যায়''।

লন্ডন ম্যাগাজিনের ১৭৩৮-এর জুন সংখ্যাতেও প্রায় হুবহু এক খবর ঃ ''গত ১১ থেকে ১২ অক্টোবর রাতে, গঙ্গার মোহনায় ভয়ঙ্কর এক তুফান আছড়ে পড়ে স্থলভাগের প্রায় তিনশো কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় এক ভয়ানক ভূমিকম্প। যার ফলে নদীর দুই তীরের বাড়িঘর ধ্বসে যায়। শুধুমাত্র কলকাতা নামের ইংরেজ অধিকৃত বন্দর-শহরেই দুশোটি বাড়ি ভেঙে পড়ে। সুউচ্চ ও বিশাল ইংরেজ গির্জার বুরুজটি অটুট অবস্থায় মাটির নীচে চলে যায়। প্রায় বিশ হাজার জাহাজ, পানসি, ডিঙি, নৌকা, ডোঙা ইত্যাদি ঝড় ও জলের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়ে ...জাহাজের মাঝিমাল্লাদের সলিলসমাধি হয়। ... চারটি ওলন্দাজ জাহাজের মধ্যে তিনটি লোক লস্কর মালপত্র সমেত নিখোঁজ। সবমিলিয়ে লাখ তিনেক লোকের জীবনহানির খবর মিলেছে। স্বাভাবিক উচ্চতার থেকে ৪০ ফিট বেশি উচ্চে গঙ্গার জলস্তর উঠে যায়''।

এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে জন্তু-জানোয়ারের দুর্দশার ছবিঃ ''বিরাট সংখ্যায় গৃহপালিত পশু, প্রচুর বাঘ এবং বেশ কিছু গণ্ডার ডুবে মরে। জলের প্রচণ্ড আলোড়নে এমনকি কুমিরগুলিও দম আটকে মরে, ঝড়ে হাজার হাজার পাখি নদীর জলে ডুবে মরে''।

সেই সমুদ্রের বুক থেকে জাহাজ উড়ে স্থলভাগে গিয়ে পড়ার কথা ঃ ''ষাট টনের নৌকো বড়ো বড়ো গাছের মাথা টপকে উড়ে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়ে''।

সমসাময়িক Gentleman's Magazine-এও এক খবর বেরলো। তার সঙ্গে যুক্ত হল রোমহর্ষক মানুষখেকো কুমিরের গল্প। গল্পটি নিম্নরূপঃ সমুদ্রের থেকে গলা ধাক্কা খেয়ে এক ফরাসি মালবাহী জাহাজ স্থলে এসে আটকেছে। জল সরে যাবার পর কর্মচারীরা জাহাজের খোলে নেমে মালপত্র জরিপ করতে নেমে আর উঠে আসছে না। একজনের খোঁজে আরেকজন নামছে সেও আর বেরোয় না। কী হল মাল্লাদের? কোথায় গেল তারা? শেষমেশ ভেতরে জোরালো আলো ফেলে দেখা গেল — সেখানে আটকে প্রকাণ্ড এক কুমির। জাহাজের খোলে নামা মাত্রই মাল্লারা কুমরের পাকস্থলীতে চালান হয়ে যাচ্ছে।

এই অব্দি তো সাদা-চামড়াদের কথা বিবৃত হল। সাইক্লোনের পর কালাদের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছিল?

কলকাতার কালাদের পাড়ায় মোটে ২০টি মাটির বাড়ি ছাড়া আর সব ধূলিস্যাৎ। ইংরেজ জমিদারের ভাগ্যে এবার আর খাজনার শিকে ছিঁড়বে না। এই শঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে কোম্পানির কাছে জমা দেওয়া সাদা চামড়া জমিদারের রিপোর্টে। রিপোর্টে মানুষের জীবন, চাষাবাদের জমি ছাড়াও কাছাড়ি, থানা, বাজার, সেতু, গুদামবাড়ি ইত্যাদি শহরের নানা পরিষেবার ক্ষয়ক্ষতিরও উল্লেখ আছে। ১৭৩৭-এর আগে কলকাতার বেশিরভাগ বাড়িই ছিল খড়ের চালা মাটির বাড়ি। এমনকি কোম্পানির বহু বাড়িও ছিল কাঁচাবাড়ি। এই বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে বাড়ি পাকা করার হিড়িক ওঠে।

অবশ্য ভূকম্প-বিশেষজ্ঞ রজার বিলহ্যান ১৭৩৭-এর ভূকম্পনের ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত নন। ১৯৯৪-এ প্রকাশিত 'The 1737 Calcutta Earthquake and Cyclone evaluated' শীর্ষক একটি গবেষণা পত্রে (নেটলোকে লভ্য) তিনি ভূকম্পনের তত্ত্বকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর সবথেকে বড়ো যুক্তি—ভূকম্পনের উল্লেখ সংবাদপত্রের পাতায় উপস্থিত থাকলেও কোম্পানির দুর্যোগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিতে তা অনুপস্থিত। তবে প্রবল নিম্নচাপ সহসা যদি অতিপ্রবল উচ্চচাপ সঞ্চার করে, বা বঙ্গোপসাগরে যদি আচমকা ধুমকেতু এসে আছড়ে পড়ে সেক্ষেত্রে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে মৃতের সংখ্যা কিছুতেই লাখের ওপরে উঠবে না, কারণ ১৭৫৭-র আদমসুমারি অনুযায়ী আমরা বন্যা কবলিত অঞ্চলের কথা বললাম, তার জনসংখ্যা অনধিক ৪৫০০০।

এই বিপর্যয়ের উল্লেখ ১৮৩৭-এ প্রকাশিত ভারতের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রথম বই। সেকালের কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে চেনবার এক আকর গ্রন্থ—জেমস র‍্যানাল্ড মার্টিন-এর 'নোটস অন মেডিক্যাল টপগ্রাফি অফ ক্যালকাটা'-র (এটিও নেটলোকে সুলভ্য) প্রথম অধ্যায় 'হিস্টরিক্যাল নোটিসেস'-এও উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য ঘটনাটি Gentleman's Magazine থেকে উদ্ধৃত।

কলকাতা ও বাঙলার অতীত নিয়ে আবার তো বাঙালিদের মধ্যে ও ঔৎসুক্য মাথা চাড়া দিচ্ছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে লিখুন না কেউ এক ঐতিহাসিক উপাখ্যান। টাইম মেশিনে চাপতে বেশ মজা লাগে না? চাপলে স্বাস্থ্যও ভাল হয়।

উমা

বৈচিত্র্যময় আলোচনাসভা

সমীরকুমার ঘোষ

এদেশে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ
মনোরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজের কথা।
তৃতীয় পর্ব

মানবমন পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাতেই সমাজ, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ থাকত। তার সামান্য কিছু নমুনা পেশ করছি। কিন্তু শুধু পত্রিকা প্রকাশ করেই থেমে থাকেন নি। পাভলভ ইনস্টিটিউট এবং মানবমন-কে নিয়ে একদিকে কুসংস্কার ও পিছিয়ে-পড়া চিন্তাভাবনা, অন্যদিকে সারা পৃথিবীতে গজিয়ে-ওঠা সমস্তরকম ক্ষতিকারক মানববিরোধী দর্শন—দুইয়ের বিরুদ্ধে চালাতে থাকলেন অক্লান্ত লড়াই। সেই সঙ্গে নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, দেখাচ্ছেন বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের চিত্রকল্প। এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত আয়োজন করতে শুরু করলেন নানা ধরনের আলোচনাচক্রের। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমশ তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকল। ডাক আসতে লাগল আলোচনাসভায় যোগদানের।

নিজের প্রবল ব্যস্ততা সত্ত্বেও পাভলভের প্রচার-প্রসারের জন্য আমন্ত্রিত বক্তা হয়ে ছুটে যেতেন রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে। একবার তো ব্যাঙ্গালোর, মানে এখনকার বেঙ্গালুরুর এক আলোচনাসভা থেকে ফেরার সময় প্রাণ যেতে বসেছিল। সেটা ১৯৭৪। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে ফেরার পথে ট্রেনে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। প্রাণসংশয় হয়ে ওঠে। ভেলোর হাসপাতাল কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে নিয়ে গিয়ে বাঁচানো হয় তাঁকে।

আমার কাছে থাকা নথি থেকে কয়েকটা আলোচনাসভার কথা জানাই। ১৯৮৬-র ২৫ আগস্ট 'পাভলভ দিবস' পালিত হয় গোর্কি সদনে। জুলাইয়ের ৮ বা ১৫-র জন্য গোর্কি সদন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হলেও অনুষ্ঠান হয় আগস্টে। বিষয় ছিল 'রুটস অভ অ্যাগ্রেসন অ্যাজ সায়েন্স সিজ ইট'। বক্তা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক।

বায়েকেমিস্ট্রির ড. জে জে ঘোষ এবং সমাজবিদ্যা বিভাগের ড. বেলা দত্তগুপ্ত। ছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী এবং ধীরেনবাবু নিজে। দেখানো হয় তিনটি তথ্যচিত্র 'অ্যাকিউজড ফর জেনোসাইড', 'হু শুটস অ্যাট দ্য রিপাবলিক' এবং 'মাম্মি, মাম্মি, হোয়াই ইট ইজ সো হট?' তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অম্বরীশ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন উপাচার্য ড. সুশীল মুখোপাধ্যায়। ১৬ অক্টোবর ১৯৮৭, গোর্কি সদনেই পাভলভ দিবসের অনুষ্ঠান হয়। ছিলেন তৎকালীন তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পাভলভের সদস্যরা 'লেনিন সরণী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯-এর দুপুরে আলোচনাসভার আয়োজন করে পাভলভ ইনস্টিটিউট। আলোচ্য ছিল 'বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরি অংশ নেন। 'তৃতীয় প্রযুক্তি বিপ্লবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক' নিয়ে দু দিন আলোচনা হয় বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে, ২৯ ও ৩০ জুন ১৯৯১। তিনটি প্রশ্ন সবার সামনে রাখা হয় —নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ বন্ধ থাক, প্রযুক্তি প্রয়োগ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে বন্ধ থাক এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ চলুক। প্রথম দিন ধীরেনবাবু ছাড়াও বক্তা ছিলেন সমরেশ মজুমদার, ড. বেলা দত্তগুপ্ত, ড. তারকমোহন দাস, ড. গণেশ বেদজ্ঞ ও যুগলকান্তি রায়।

'মোরাটোরিয়াম বি ডিক্লেয়ার্ড অন ফারদার প্রগ্রেস ইন টেকনোলজি' নিয়ে বিতর্কে অংশ নেন শঙ্কর চক্রবর্তী ও ডাঃ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। শ্রোতাদের অংশগ্রহণে খুবই জমে উঠেছিল সেই বিতর্ক। দ্বিতীয় দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতার মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। 'হেলথ্ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' নিয়ে বলেন ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ ও পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত। 'এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন ইজ ইনএভিটেব্‌ল' বিতর্কে অংশ নেন ড. আশিস ঘোষ এবং ড. ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। মানবমন পত্রিকার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৯ মার্চ ১৯৯২, রবিবার, বেলা একটায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে বিশেষ সভা হয়। আলোচ্য ছিল 'পণ্যপূজার মনস্তত্ত্ব ও আর্থসামাজিক দিক'। বক্তা ছিলেন তৎকালীন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব, ড. বিপ্লব দাশগুপ্ত এবং ধীরেন্দ্রনাথ। ইনস্টিটিউটের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৯৩-এ তিনদিনের অনুষ্ঠান হয়। প্রথম দিন, ৩০ জানুয়ারি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। আলোচ্য ছিল 'পাভলভ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সেস'। বলেন ড. জে জে ঘোষ, ডাঃ বি মুখার্জি এবং ধীরেন্দ্রনাথ। ৩১ তারিখের অনুষ্ঠান হয় মৌলালির যুবকেন্দ্রে, দুই পর্বে। প্রথমে 'হোয়াই সাইকিয়াট্রি' নিয়ে আলোচনা করেন ড. এস বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বি ভট্টাচার্য, ড. এস ভট্টাচার্য ও ড. এ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্বে 'সেলফ অ্যান্ড স্পিসিস প্রিজার্ভেশন' নিয়ে বলেন ড. অম্লান দত্ত, ডাঃ আই সেনগুপ্ত, অধ্যাপক জি ভদ্র ও ধীরেন্দ্রনাথ। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয় বিজন থিয়েটারে। পাভলভ ইন্টিটিউট নাট্য সংস্থার সদস্যরা মঞ্চস্থ করে 'অপারেশন ফাউস্টাস'। এই উৎসব উপলক্ষে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল এক স্মারকপত্র। তাতে ধীরেনবাবু লিখেছিলেন, 'আ গ্লান্স ইন্টু দ্য পাস্ট', আশীষ লাহিড়ী লিখেছিলেন 'সায়েন্টিফিক অবজেক্টিভিটি অ্যান্ড পাভলভ'। পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্য সংস্থার খানিকটা পরিচয়ও ছিল। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ দুপুরে দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ে আলোচনার বিষয় ছিল 'নয়া প্রযুক্তি ঃ ফিরে চল মাটির টানে'। তারকমোহন দাস, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা দত্তগুপ্ত, দেবাশিস বক্সি, সমর বাগচী প্রমুখ অংশ নেন। এখানে ছটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। তাতে আধুনিক অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য প্রযুক্তি যে আমাদের ব্যাপক জনসাধারণের 'জীবনসমস্যার সমাধান' করতে পারেনি, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছিল। উন্নত দেশগুলোর নিজেদের স্বার্থে চাপিয়ে দেওয়া প্রযুক্তি আমাদের নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করতে হয়। তার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালানো দরকার। আর তার জন্য জনসাধারণের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত ধারণার সার্বিক উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

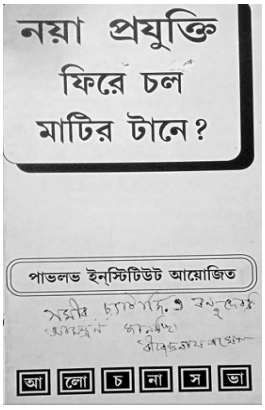

মানবমন-এর রজতজয়ন্তী উৎসব পত্রিকার ২৫ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের কথা আলাদা করে বলা দরকার। এটি বেশ ধুমধাম করেই পালিত হয়। এ নিয়ে অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে এবং ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য ও অসিতরঞ্জন চক্রবর্তীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গড়া হয় রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি। কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আয়োজনে অর্থসাহায্য করেছিল। ১৯৮৬-র ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি মৌলালির যুবকেন্দ্রে দু দিনের উৎসব হয়েছিল। সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা। দুপুরে নিখরচায় উত্তম ভূরিভোজের আয়োজন। উৎসবের উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। পৌরোহিত্য করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন গোপাল হালদার, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। দু দিনের আলোচ্য ছিল 'মানসিক ব্যাধি ও আমাদের কর্তব্য'। সেই সময় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিনের দুই অধ্যাপক ডঃ সুখময় ভট্টাচার্য ও ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল এই উদ্যোগে শরিক হয়েছিলেন। ওঁরা তখন 'ডাঃ নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' নামে এক সংগঠন চালাতেন। এসেছিলেন অসিতরঞ্জন চক্রবর্তী নামে একজন। উদ্বোধন অধিবেশনের পর কফি বিরতি দিয়ে শুরু হয় আলোচনাচক্র। সভাপতিত্ব করেন মনোরোগ চিকিৎসক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী। ওঁর ইসিটি-র পক্ষ নিয়ে মন্তব্যে সভায় তীব্র বাদানুবাদ হয়। অনেকেই এর প্রতিবাদ করেন। এই ইসিটি নিয়ে একটু বলি। আগে মানসিক রোগীদের, বিশেষত যারা উন্মত্ত বা

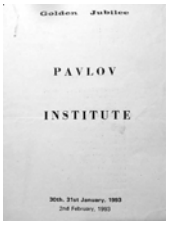

আত্মহত্যাপ্রবণ, তাদের গণহারে ধরে ধরে শক দেওয়া হত। সাধারণ লোকের লব্জই ছিল, 'ও মাথা খারাপ হয়েছে? শক দিয়ে আনো ঠিক হয়ে যাবে।' এই শক-চিকিৎসাকে পরিভাষায় বলা হয় ইসিটি বা ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি। অন্য ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার কারণে পরে এই চিকিৎসাপদ্ধতি বিদেশে প্রায় সব দেশে নিষিদ্ধ হলেও আমাদের দেশে চালু ছিল। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য ছিল, যে সব চিকিৎসক বিদেশ থেকে একগাদা দাম দিয়ে মেশিন কিনতেন, তাঁরাই মেশিনের দাম তোলার জন্য গণহারে শক দিতেন, রোগীদের ক্ষতি হলেও। যাই হোক, প্রথম পর্বে বক্তা ছিলেন ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলি ও ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়। দুপুর একটায় মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি। এই ব্যাপারেও অভিনবত্ব ছিল। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে খাওয়ানো হয়েছিল বিরিয়ানি। পরের পর্বে আলোচনায় অংশ নেন ড- বেলা দত্তগুপ্ত ও ডাঃ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। এদিন 'অলৌকিক নয় লৌকিক' নামে এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, উৎসবের আয়োজন নিয়ে আমরা যখন তুমুল ব্যস্ত, তখন কোথা থেকে এসে জুটে গিয়েছিল প্রবীর ঘোষ। বিশেষ প্রদর্শনীটি সে ছেলেকে নিয়ে করেছিল। পুরোটাই ফ্লপ। তার আগেই প্রবীরের কাজকর্মে ধীরেনবাবু বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যে মন্তব্য আমাদের কাছে করেছিলেন, তা না বলাই শ্রেয়। পরে এই প্রবীর ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি নামে একটা সংস্থা গড়ে। শোনা যায়, পরে ওকে সমিতি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এখান-ওখান থেকে টুকলি করে অনেকগুলো বই লিখে জনপ্রিয় হয়। উৎস মানুষে প্রকাশিত একটা লেখায় ভুল ছিল। পরের সংখ্যায় যার সংশোধনী বেরোয়। কিন্তু তা না দেখে সেই লেখা ভুল সহ-ই হুবু ছেপে দিয়েছিল নিজের বইতে, ঋণস্বীকার না করে। উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল একটি স্মারকগ্রন্থ। কমিটির হয়ে সেটি প্রকাশ করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপর।

লেখালিখি — চিকিৎসা, পাভলভ-চর্চা ইত্যাদির পাশাপাশি দু হাতে লেখালিখি চালিয়ে গিয়েছেন। মানবমন পত্রিকা তো ছিলই, পাশাপাশি মনোরোগ, মনোবিজ্ঞান নিয়ে লিখেছেন বই। আর নাটক তো তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল। শুধু লেখা নয়, নাটকের দল গড়ে নিয়মিত অভিনয়ও করিয়েছেন। অসংখ্য বই লিখেছেন। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বই 'পাভলভ পরিচিতি'। যা সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পেয়েছিল। এটি প্রথমে চার খণ্ডে, পরে দু খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন দু খণ্ডে বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, মনের অসুখ, মনোরোগ ও মনোবিদ, শৈশব ও তার সমস্যা, কৈশোর ও তার সমস্যা, বিশ শতকের সমাজ-ভাবনা ইত্যাদি। নাটকের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থেকেই পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্যদল গড়েছিলেন। নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থও হত। সেই সূত্রে লেনিন সরণী, অপারেশন ফাউস্টাস, মরুঝঞ্ঝা, কল্মাষপাদ, সম্রাট, স্ত্রী চরিত্র ইত্যাদি নাটক লিখেছেন। সেভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার ছাড়াওকাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার, গিরিশ পুরস্কার ইত্যাদি। **(চলবে)**

উমা

স্বচিকিৎসা পর্ব — ৯

তস্য পর্ব : বার্ধক্য ৪

গৌতম মিস্ত্রী

কিছু শারীরিক কষ্ট একটু অন্যরকমের — অন্যরকম , তার কারণ আর তার সমাধান। বেশ কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য হাজারো রকমের ট্যাবলেট, সিরাপ, ইনজেকশন, মলম, করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, স্টেন্ট ইত্যাদি আছে। সেই চিকিৎসায় রোগের উপশম, রোগমুক্তি ইত্যাদি মিললেও অন্য কিছু রোগের রোগলক্ষণ সর্বোত্তম চিকিৎসা সত্ত্বেও থেকে যায়। সেটা অবহেলার যোগ্য নয়। সেই রোগের নাম বার্ধক্য। যার সমাধানের জন্য এখনও কোনো ম্যাজিক ওষুধ আবিষ্কার করা যায়নি। সেই কষ্টের 'না-অসুখ' বা বার্ধক্য মানব শরীরের এক প্রাকৃতিক অমোঘ অন্তিম অবতার। তার নিরাময়ে কোনো ম্যাজিক ট্যাবলেট কাজে লাগে না। বার্ধক্য তো কোনো রোগ নয়। বার্ধক্য হল অসুখের এক 'না-রোগ-অবতার' — মৃত্যুর আগের এক অতি স্বাভাবিক ও পরিবেশ-বান্ধব (ইকো-ফ্রেন্ডলি) অবস্থা যার ওষুধ থাকতে নেই। কেমনে তার মোকাবিলা করা যায়? আসুন তার আলোচনায় কিছুটা সময় ব্যয় করি।

১) গেঁটে বাত (অস্টিওআর্থারাইটিস) — পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার কথা। সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষদের বৃদ্ধ বয়সেও উল্লেখ করার মতো গেঁটে বাত হত না। একিবংশ শতাব্দীর মানুষদের চল্লিশ পেরোলেই হাঁটু বা কোমরে ঘুরে ফিরে ব্যথা হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে যেতেই হয় আপদ বিদায়ের জন্য। ডাক্তার নিদান দেন, আপনার ব্যথা কমে, কিন্তু রোগ সেরে যায় না। আবার এক দেড় বছর, অথবা রোগ পুরনো হলে ছয় মাস পরেই আবার যে কে সেই। আবার ডাক্তারের দ্বারস্থ হওয়া, আবার ওষুধ খাওয়া। এক দুই বছরে আমি আপনি জেনে যাই রোগলক্ষণউপশমের ওষুধের বেশ কয়েকটি নাম। সম্ভবত আপনার চিকিৎসকও ওষুধের অত বাণিজ্যিক নাম জানেন না। বিচক্ষণ ডাক্তার প্রথমদিনেই নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করে ফেললেও হাঁটু আর কোমরের এক্সরে, এম আর আই, পায়ের নার্ভ কন্ডাকশন টেস্ট ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষা আপনাকে করতেই হয়, নইলে দীর্ঘদিন ধরে নাছোড়বান্দা একটা গুরুতর রোগের জন্য চিকিৎসাটা বেশ খেলো হয়ে পড়ে। চিকিৎসার ফলাফল আশাপ্রদ হবার কথা নয় বলেই একটা ঝকমারি চিকিৎসার ভড়ং দরকার। আপনার মানসিক চাহিদার জন্যও।

গেঁটে বাত বা অস্টিওআর্থাইটিস হাঁটুতে যেমন হয়, আবার সে মেরুদণ্ডের উপরের ও নীচের কশেরুকাগুলোকেও (ভারটিব্রা) আক্রান্ত করে। অপঘাতে বা দুর্ঘটনায় অকালমৃত্যু না হলে মৃত্যু হঠাৎ হয় না। লাইটের সুইচ অন করার মতো ক্রিয়ায় আমাদের জীবন শুরু হয় না, মানুষকে জন্মের পরে দুপায়ে খাড়া হওয়া শিখতে হয়, হাঁটা শিখতে হয়। সেই মতো লাইটের সুইচের অফ করার মতো ক্রিয়ায় আমাদের মরণ হয় না। যৌবন বিদায় নিলে আমাদের জন্মের পরে অর্জিত বিদ্যা ক্রমশ ক্ষয় হয়। গেঁটে বাত তেমনই এক 'এন্ট্রপি' অর্থাৎ 'অস্থিতাবস্থা' হারানোর ক্রিয়া। বাতের ব্যথাকে জীবনের শেষের দিকে ঠেলে সরিয়ে রাখতে গেলে আমাদের এন্ট্রপি ধরে হবে। এন্ট্রপি হারানোর ক্রিয়ায় গেঁটে বাতের কারণগুলো আগে জেনে নিতে হবে। এন্ট্রপি শব্দটা আমার কাছেও নতুন। এ বিষয়ে বিশদে জানার জন্য গুগলকে জিজ্ঞেস করতেই পারেন। অথবা এই বার্ধক্য সিরিজের প্রথম প্রকাশিত রচনা পড়তে পারেন (উৎস মানুষ এপ্রিল-জুন, ২০২২)।

হাঁটুর ব্যথার একমাত্র কারণ না হলেও ব্যবহারিক দিক দিয়ে হাঁটুর ব্যথার অন্যতম কারণ 'অস্টিওআর্থাইটিস' নামের একটি রোগ। আগে মনে করা হত এটি কেবলই একটি অস্থিসন্ধির ক্ষয় রোগ বা 'ডিজেনারেটিভ জয়েন্ট ডিজিজ'। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অস্থসন্ধির ব্যবহারজনিত কারণে দুটি হাড়ের জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধির যন্ত্রাংশ ক্ষয়ে গিয়ে যা হয় আর কি! এখন অবশ্য রোগের কারণ হিসাবে প্রদাহ বা inflamation-এর একটা অতিরিক্ত ও ক্ষুদ্র ভূমিকা উল্লেখ করা হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখলে ভাল, ইউরিক অ্যাসিডের প্রভাবে হাঁটুর ব্যথা ভূতের গল্পের এক আধুনিক সংস্করণ। রক্তের উচ্চ মাত্রার ইউরিক অ্যাসিড আর যাই করুক না কেন, হাঁটুকে নিশানা করে না।

অস্টিওআর্থাইটিস হাঁটুর ব্যথার রোগের প্রায় ৯৫ শতাংশের কারণ। অস্টিওআর্থাইটিস রোগের নামের মধ্যেই অনেক না বলা কথা বলা আছে। এটা একধরনের হাঁটুর অস্থিসন্ধির বা

গাঁটের ক্ষয় রোগ। সারাজীবন আমাদের মেদভারে ভারিক্কি শরীর বয়ে বেড়ানোর ফলে যে হাঁটুর উপরে যে ধকল যায় তার ফলে হাঁটুর অস্থিসন্ধি হাড়ের মাঝের ঘাত সইয়ে নেওয়ায় (শক অ্যাবজরবার) কোষ-কলা স্বরূপ তরুণাস্থি (কারটিলেজ বা মেনিস্কাস), আর পিচ্ছিলকারী পদার্থ (লুব্রিকেন্ট) স্বরূপ অস্থসন্ধির ভেতরের সাইনোভিয়াল ফ্লুইডের স্বাভাবিক 'ন্যাচারাল উইয়ার অ্যান্ড টিয়ার' অর্থাৎ ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়ই হল হাঁটুর ব্যথার অন্যতম কারণ। হাঁটুর যান্ত্রিক নকশায় বেশ একটা কোমল আহ্লাদী ভাব আছে--- আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলে প্রাকৃতিক উপায়ে সেরে যাবার উপায় নেই। কারণ হাঁটুর অস্থিসন্ধির দুই হাড়ের মধ্যের শক অ্যাবজরবার অর্থাৎ মেনিস্কাসে রক্ত সরবরাহ হয় না। রক্ত সরবরাহের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মেনিস্কাসে মেরামতের ওষুধবিষুধ পৌঁছাতে পারে না। দামি বা সস্তা কোনো ওষুধই— যেমন ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বা অত্যন্ত ব্যয়বহুল অকাজের তরুণাস্থি নির্মাণক্ষম গ্লুকোজামিন ক্ষয়গ্রস্ত হাঁটুর ক্ষয়ে যাওয়া অংশে পৌঁছানোর উপায় নেই। কোনো অত্যাধুনিক চিকিৎসায়ই হাঁটু আবার আগের সুস্থ অবস্থায় ফিরে যায় না। যে কোনো অঙ্গের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঠিকঠাক করার জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা রক্তের মাধ্যমেই কাঁটা-ছেঁড়া অঙ্গে পৌঁছায়। সেই কারণে মেনিস্কাস ছিঁড়ে গেলে কোনো চিকিৎসায়ই আবার আগের মতো হবার উপায় নেই। হাঁটুর সুস্থতা ও অসুস্থতা একটা সহজ সরল যান্ত্রিক বিষয় বা মেকানিকাল ফ্যাক্টরের উপরে নির্ভরশীল। শরীরের ওজন বেশি হলে হাঁটুর ক্ষয় বেশি হবে আর সেটা অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই হবে এটাও সহজবোধ্য। হাঁটুর অস্টিওআর্থাইটিসের ব্যয়বহুল ও সাময়িক কাজের চিকিৎসা হিসাবে হাঁটুতে পিচ্ছিলকারী (লুব্রিকেন্ট) হায়াল্যুরোনিক অ্যাসিড ইনজেকশন বা হাঁটু বদলের অপারেশন কাজের।

বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা না দিয়ে নামী দামী বোতলবন্দী এনার্জি ড্রিঙ্ক এবং নানারকম ভক্ষণযোগ্য প্রোটিন-বার ইত্যাদি কর্পোরেট বিজ্ঞাপনের শিকার না হয়ে বাঁচাটাই এখন চ্যালেঞ্জের। নিয়মিত অ্যারোবিক শরীরচর্চার অভ্যাসের প্রয়োগে নিজের শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ও হাঁটুর উপরের ও নীচের পেশির সক্ষমতা ধরে রাখা দরকার। বার্ধক্যে সচল হাঁটু বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনঃ ১) মোটা না হওয়া, ২) দৈনিক হাঁটুর ব্যবহার হয় এমন ব্যায়াম করা —যেমন ৩-৫ কিলোমিটার হাঁটা অথবা সাঁতার কাটা ৩) ব্যায়ামের মাধ্যমে হাঁটুর ওপরের (উরুর) ও নীচের পেশির শক্তি বজায় রাখা। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, হাড় থেকে ক্যালসিয়াম বর্জন রোধের ওষুধ আর গ্লুকোসামিন ওষুধ হাঁটুর ব্যথা কমানোর জন্য কেবল অকাজেরই নয়, এই চিকিৎসার কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নেই।

বেশ কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হাঁটুর গেঁটে বাতের জন্য দায়ী বলে জানা যায়। বার্ধক্যজনিত ক্ষয়, কম বয়সে হাঁটুর আঘাত, স্থূলতা, বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য (জেনেটিক), জন্মসূত্রে পাওয়া হাঁটুর বেয়াড়া গঠনকে হাঁটুর ব্যথার জন্য উল্লেখ করা হয়। মোটা মানুষদের হাঁটুসহ অন্যান্য অস্থিসন্ধির ক্ষয় হয়। শরীরের অতিরিক্ত মেদ থেকে তৈরি হয় প্রদাহ সৃষ্টিকারী উৎসেচক প্রোটিন (proinflammatory cytokines, including IL-6, TNF-alpha, leptin)। এই অবাঞ্ছিত প্রোটিন অস্থিসন্ধির প্রদাহের একটি কারণও বটে। এই কারণে যে অস্থিসন্ধিগুলো— যেমন কাঁধ, হাতের আঙুল; যে অস্থিসন্ধিগুলো শরীরের ভার বয় না মোটা মানুষদের সেই গাঁটেও অস্টিওআর্থাইটিস হয়। বিরল ক্ষেত্রে জিন বা বংশাণুগত কারণে (genetic factor) পারিবারিক বা নিজস্ব বংশানু মিউটেশন কুফল স্বরূপ অস্থিসন্ধির তরুণাস্থির কোষকলার অন্যতম পদার্থ বা কোলাজেনের কয়েকটি কলা (টিস্যু) জন্মলগ্নেই দুর্বল হয়ে থাকে (types II, IX & XI collagen)। একটা সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, প্রতি ৭৫০০ থেকে ৯০০০ নবজাতকের হাঁটুর ও অন্যান্য অস্থিসন্ধির তরুণাস্থি জন্মলগ্নেই এই সমস্যা নিয়ে জন্মায়। বংশাণুগত অভিশাপ(!) না থাকলেও হাঁটুর গঠনগত তারতম্যে হাঁটুর ক্ষয় বেশি হয়। হাঁটুর উপরের হাড় (ফিমার) ও নীচের হাড়দ্বয় (টিবিয়া ও ফিবুলা) খাপে খাপে না বসলে, বাইরের দিকে বেঁকে থাকলে (varus deformity, bow-legged) বা ভিতরের দিকে বেঁকে থাকলে (valgus deformity, knocked-knee) হাঁটুর ক্ষয় যে বেশি হবে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যদিও পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের হাঁটু আর হাতের অস্থিসন্ধির বাতের রোগ বেশি, কোমরের বাতের রোগ পুরষ-নারী ভেদাভেদ করে না। মহিলাদের ঋতুজরার (মেনোপজ) পরে ইস্ট্রোজেনের

উৎসেচকের (oestrogen) আপেক্ষিক অভাবে অস্থিসন্ধির বাতের রোগ বেশি হয় লক্ষ্য করা গেছে। জানা নেই, সেটা ঘটনার সমাপতন নাকি কার্যকারণ সম্পর্কিত।

সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষের (হোমো সেপিয়েন্স) হাঁটু ও অন্যান্য বড় অস্থিসন্ধির বাতের রোগ মূলত নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকার জন্য প্রাকৃতিকভাবে প্রস্তুত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবদানে পরিবর্ধিত আয়ু উপভোগ করার জন্য, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে নেচেকুঁদে বেড়ানো বুদ্ধিমান মানুষের হাঁটু সচল রাখার জন্য যেটা করা দরকার, সেটা সে করছে না। ক্রমহ্রাসমান শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনে স্থবির আধুনিক মানুষের হাঁটুর বাঁধন শক্ত করা উরু আর পায়ের পেশি ক্রমশ দুর্বল হয়ে হাঁটুর উপরে বেশি ভার চাপাচ্ছে। শক্তিঘন খাবার খেয়ে তা ক্ষণিক সুখ উপভোগ করে মেদভাবে ভারিক্কি হয়ে হাঁটুকে আরও বেশি ভার বইতে বাধ্য করছে। ভরা যৌবনেই আধুনিক সচ্ছল মানুষ বেতো ঘোড়ার সওয়ারি হয়ে অকালেই বার্ধক্যে প্রবেশ করছে।

বুদ্ধিমান মানুষ কোনো সমস্যা চিরন্তন ও অমোঘ ধরে নিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায় না। মানুষ সমস্যার গভীরে পৌঁছে সমস্যার মোকাবিলা করার স্পর্ধা রাখে। ক্রমশ বেড়ে যাওয়া বয়স, হাঁটুর গঠনের জন্মগত ত্রুটি, কম বয়সে হাঁটুর উপরে অত্যাচার ও আঘাত ইত্যাদির ফলে আমরা বিক্ষত করি চিরকালের জন্য হাঁটুর মধ্যেকার ঘাত-সয়ে নেবার (শক অ্যাবজরবার) তরুণাস্থি—মেনিস্কাস। এই ক্ষত পূর্বের স্বাস্থ্যকর অবস্থায় ফেরার নয়। বৈজ্ঞানিকদের কাজ থেমে নেই। হাঁটুর বেতো বাতের রোগে অ্যাডভান্সড গ্লাইকেশন অ্যান্ড প্রোডাক্ট (advanced glycation end-products), কন্ড্রোক্যালসিনোসিস (chondrocalcinosis)-এর চোরাগোপ্তা আক্রমণের কথা মানুষ জানতে পেরেছে। বয়সের সাথে সাথে আমাদের ভারবাহী অস্থিসন্ধি (ভারবাহী নয় এমন বড় অস্থিসন্ধিও বটে) পূর্ণ মাত্রায় কর্মক্ষম থাকে না। অস্থিসন্ধির যন্ত্রাংশ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। বিশেষ করে কন্ড্রোক্যালসিনোসিস প্রক্রিয়া হাড়ের প্রান্তে অস্থিসন্ধিতে হাঁটুর হাড়ের মধ্যেকার শক অ্যাবজরবার অর্থাৎ তরুণাস্থিতে ক্যালসিয়াম জমে অস্থিসন্ধির সাবলীল প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে তার ফলে হাঁটুতে ব্যথা হয় নমনীয় তরুণাস্থির ক্যালসিয়াম প্রাপ্তির কাঠিন্য লাভের প্রভাবে। এটা উল্লেখ করা উচিত যে, হাঁটুর ব্যথায় ক্যালসিয়ামের বড়ি খাওয়া কেবল অকাজের নয়, ক্ষতিকারকও বটে।

এই মুহূর্তে এটা নিঃসংশয়ে বলা যায়, বার্ধক্যে সচল হাঁটু নিয়ে চলে ফিরে বেড়ানোর জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর ও পরিমিত সুষম খাদ্যে তৃপ্ত থাকা। বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা না দিয়ে নামী দামী বোতলবন্দী এনার্জি ড্রিঙ্ক এবং নানারকম ভক্ষণযোগ্য প্রোটিন-বার ইত্যাদি কর্পোরেট বিজ্ঞাপনের শিকার না হয়ে বাঁচাটাই এখন চ্যালেঞ্জের। নিয়মিত অ্যারোবিক শরীরচর্চার অভ্যাসের প্রয়োগে নিজের শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ও হাঁটুর উপরের ও নীচের পেশির সক্ষমতা ধরে রাখা দরকার। বার্ধক্যে সচল হাঁটু বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনঃ ১) মোটা না হওয়া, ২) দৈনিক হাঁটুর ব্যবহার হয় এমন ব্যায়াম করা —যেমন ৩-৫ কিলোমিটার হাঁটা অথবা সাঁতার কাটা ৩) ব্যায়ামের মাধ্যমে হাঁটুর ওপরের (উরুর) ও নীচের পেশির শক্তি বজায় রাখা। **ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, হাড় থেকে ক্যালসিয়াম বর্জন রোধের ওষুধ আর গ্লুকোসামিন ওষুধ হাঁটুর ব্যথা কমানোর জন্য কেবল অকাজেরই নয়, এই চিকিৎসার কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নেই।**

অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে বর্ধিত আয়ুর কারণে বাতের ব্যথার এই রোগে বিত্তবান মানুষদের অবধারিত অনুষঙ্গ। বাতের ব্যথা ক্যালসিয়াম অথবা ভিটামিন ডি-র ট্যাবলেট বা পাউডার খেয়ে বিদায় নেয় না। বাতের ব্যথা হয় অস্থিসন্ধির কারণে। হাঁটুর ব্যথা সারবার নয় এটা বিচক্ষণ ডাক্তার বিলক্ষণ জানেন। সফল রোগমুক্তির জন্য কেবল চিকিৎসক নয়, রোগীকেও প্রস্তুত হতে হয়।

উ মা

প্রিয় গ্রাহক ও পাঠক বন্ধুরা,
৪২তম কলকাতা বইমেলায় আপনাদের সঙ্গেদেখা হচ্ছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে।

অথ সাক্ষরতা কথা

সুব্রত গোমেশ

নিজের নামটি স্বহস্তে লিখিত আকারে প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারাকে বলে স্বাক্ষরতা। আর যে ব্যক্তি দক্ষতা অর্জন করে তাকে বলা হয় সাক্ষর। একই রকম শুনতে আর একটি কথা আছে তার নাম সাক্ষরতা আর যিনি এই যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁকে বলি সাক্ষর।

১৯৭৮ সালে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দের পরিকল্পনায় আমাদের দেশের নিরক্ষর বয়স্ক নারী-পুরুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। এই কর্মসূচির নামকরণ হয় জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি। সেই সময়ে এই কর্মসূচি রূপায়নের কাজে নিযুক্ত থাকার সুবাদে কিছু জেনেছি। সেই প্রসঙ্গে কিছু বলার ইচ্ছে হল।

সেই প্রথম জানলাম লেখাপড়া না জানলে একজনকে মূর্খ বলা যায় না। আর শিক্ষা মানে কেবলমাত্র লিখতে পড়তে জানাই নয় বরং লেখাপড়া না জানা এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা লেখাপড়া জানা অনেক মানুষের চেয়ে অনেক বেশিই জানেন। তখনই জেনেছিলাম শিক্ষা হল সেই হাতিয়ার যা বাঁচার কৌশল শেখায়। সেই অর্থে অনেক লেখাপড়া না জানা মানুষ আছেন যাঁরা বেঁচে থাকার দক্ষতা অর্জন করেছেন। তবে লিখতে পড়তে জানার দক্ষতা অর্জন জীবনে শিক্ষালাভের সাথে একটি বাড়তি সংযোজন।

বয়স্ক শিক্ষায় শিক্ষার তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করা হল— সাক্ষরতা, সচেতনতা ও স্বনির্ভরতা।

প্রশ্ন হল লিখতে পড়তে জানলেই কি একজন সচেতন এবং স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন? অথবা লেখাপড়া না জেনেও কি মানুষ সচেতন বা স্বনির্ভর হতে পারেন? এর উত্তর রয়েছে মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায়। এক সময় মানুষ অরণ্যের জীবন অতিবাহিত করেছে। তখন না ছিল ভাষা না ছিল তার লিখিত কোনো রূপ, তবুও তারা এই প্রকৃতিতে টিকে গেল আর তার প্রমাণ রয়ে গেলাম আজকের আমরা। সেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা লেখাপড়া না জেনেও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পৌঁছে দিল দ্বাবিংশ শতাব্দীতে।

অরণ্যের জীবন, বড় সংকটময়। পদে পদে বিপদ বাধা কিন্তু বাঁচতেও তো হবে! ভাষা নেই। ইঙ্গিত আর কণ্ঠের আওয়াজ তাই দিয়েই প্রাথমিকভাবে ভাব বিনিময়। একটু একটু করে ভাব বিনিময়ের এক অন্য মাধ্যমের আগমন ঘটল মানবসমাজে। না জানি কী উৎফুল্লই না হয়েছিল মানুষ সেদিন যেদিন দেখেছিল তার মনের কোণে উদিত হওয়া কোনো অভিলাষ মুখগহ্বরে জিহ্বা, দন্ত ও অন্যান্য মাংসপেশীর সংকোচন প্রসারণে উৎপন্ন হওয়া একটি আওয়াজের মাধ্যমে অপর একজনের মস্তিষ্কে সঞ্চালনা করা সম্ভব হচ্ছে। তারপর আর পিছনে ফেরা নয়, সে কথা আমরা জানি। ক্রমে ভাষাই হয়ে উঠল জীবন ধারণের প্রধান হাতিয়ার। তার বহুকাল পর লিপি তথা ভাষার লিখিত রূপ মানুষের সামনে এল।

দীর্ঘকাল এই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ভাষা হয়ে গেল মানুষের অন্যতম প্রধান সঙ্গী।

সমস্যা হল ১৯৮১ সালেও সাক্ষরতার হার ছিল ৪৩%। সেই সময় দরিদ্র ও স্বচ্ছল মানুষের মধ্যে একটা বড় ব্যবধান ঘটিয়ে দিত লেখাপড়া। কথায় বলা হত 'লেখাপড়া শেখে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে' । প্রচলন এমনি ছিল যে লেখাপড়া জানা মানুষ স্বচ্ছল অন্যদিকে লেখাপড়া না জানা মানুষ দরিদ্র।

তাই দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের মধ্যে ছিল হীনমন্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব। গ্রামেগঞ্জে আঙুল তুলে বলা যেত কারা গরীব আর কারা বড়লোক। সেখানে লেখাপড়া না জানা ও জানাটাই পার্থক্য হিসেবে আগেই নজরে আসত। তাই লজ্জা লাগলেও পড়াশোনা শেখার আগ্রহ এই দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের ছিলই — বিশেষত নাম সই করার যোগ্যতা অর্জন করা তাদের কাছে একটা সম্মানের ছিল। টিপ ছাপ তাদের সম্মানে আঘাত হানত। কিন্তু সেই লেখাপড়ার জগতের দরজা তাদের বন্ধই ছিল। কারণ আর্থিক সংকট। বছরের পর বছর বিদ্যালয়ে যাওয়া, পাঠ অভ্যাস করার জন্য চাই আর্থিক যোগান, যা নিশ্চিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ধারাবাহিকশিক্ষা ব্যস্থায় বাচ্চাদের একটা দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করতে হয়। তাই তাদের জন্য একমুখা অর্থের যোগান অব্যাহত রাখতে হয় যা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তাই তারা ধরেই নিয়েছিল লেখাপড়া তাদের জন্য নয়, চাকরি বাকরি তাদের জন্য নয়, কেবলমাত্র বিত্তবানদের অধিকার এতে। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বয়স্কদের লেখাপড়া শেখার একটা তাগিদ ছিলই।

তাদের অভিমান ছিল, পড়া না পারলে যদি অপমানিত হতে হয়! এমনিতেই অনেক দুঃখ ঝঞ্ঝাট আছে জীবনে, পড়তে গিয়ে সেটা কি বেড়ে যাবে?এমনই হাজার সংশয়। এই বয়স্ক নারী-পুরুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আনতে কর্মসূচি প্রণেতাদের কতকগুলো ধারণা পরিষ্কার করতে হয়েছিল।

প্রথমত এখানে শিক্ষক-ছাত্র এই সম্পর্কটাকে ভুলে যেতে হবে। এখানে সবাই ছাত্র সবাই শিক্ষক। কারণ নিরক্ষর গ্রামবাসীর অনেক দক্ষতা আছে, অনেক অভিজ্ঞতা আছে। প্রতিটা দিন তাকে অনেক লড়াই করতে হয়, পরিবার সামলাতে হয়, ভিন্ন পেশা ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়। যিনি লেখাপড়া শেখানোর কাজ করবেন তাঁকে এই কথাগুলো স্মরণে রাখার কথা বলা হত। পড়ানোর কাজে অত্যন্ত যত্নবান হওয়ার নির্দেশিকা ছিল। পড়তে এসে যেন তাঁদের মনের বাধা কেটে যায়, নিঃসংকোচে যেন তাঁরা নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারেন, সেদিকে রাখতে হত বিশেষ নজর। কোনোপ্রকারে তাঁদের সম্মানহানি যাতে না হয় সে বিষয়ে সাবধান হতে হত।

অবশ্যই প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ সে বাধা অনেকাংশে কমাতে সহায়তা করেছিল।

দরিদ্র মানুষ চায় সরাসরি ফল, হাতেনাতে ফল। পড়াশোনা কি তাদের সেই চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল?

সে প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। যে কোনো শিক্ষার দুটি দিক থাকে একটি জ্ঞানলাভের এবং অপরটি প্রয়োগের। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের বিকাশ ঘটলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় আর সেই সচেতনতা মানুষের মধ্যে দায়িত্ব বোধ যেমন জাগায় বিচার বোধও জাগায়, ন্যায় অন্যায় বোধ জাগায়, পরিণত করে। অন্য দিকটি হল — শিক্ষার প্রায়োগিক দিক যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে নাম সই করতে পারা, চিঠি বা দরখাস্ত লিখতে পারা ইত্যাদির ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসাবে দেখতাম। তাই এই নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হওয়ার দরকার ছিল।

এখানে বর্ণপরিচয় দিয়ে শুরু করা হত না। বরং একটি বিশেষ শব্দকে বেছে নিতে হত। সেই বিশেষ শব্দটির বৈশিষ্ট্য হতে হত — এক : পড়ুয়াদের পরিচিত, দুই : উচ্চারণ সহজ, তিন : বানান সহজ, চার ঃ তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে —আমরা, বাজার, চাকরি, মজুর ইত্যাদি শব্দাবলী। এই শব্দকে ভেঙে অক্ষর পরিচয় তারপর সেই অক্ষরদের জুড়ে নতুন শব্দ গঠন। যেমন — 'আমরা' থেকে আ ম র এবং মাত্রা হিসাবে আকার শেখা, পরে এদের জুড়ে আম, আর, রাম, মরা, রমা, মামা, আমার ইত্যাদি শব্দ গঠন।

পাঠ শুরু হত একটি চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে। চিত্রটি প্রদর্শন করে পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হত— আপনারা এখানে কী দেখতে পাচ্ছেন? উত্তর আসত— একটি দরিদ্র চাষির বাড়ি তার স্ত্রী, সন্তান, গরু ইত্যাদি। প্রশ্ন—কী করে বুঝলেন দরিদ্র? পরিচিত দারিদ্র্যের চিত্র দেখা মাত্র উত্তর আসতে দেরি হত না —কারণ পুরনো খড়ের চাল, ভাঙা বারান্দা, উঠোনের প্রান্তে জীর্ণ বসন পরিহিতা স্ত্রী, শীর্ণকায় সন্তান, হাড় বের করা গাভী-বলদ সম্বলিত চিত্রটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁরা করতেন।

সেই মুহূর্তে চিত্রের অভ্যন্তরস্থ ভাবনা ও বার্তা যা চিত্রকরের রেখায় ফুটে উঠেছিল তা যে কোনো এক অচিন গাঁয়ের আঙিনায় যে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে, সে খবর কে-ই বা রাখত।

সাক্ষরতা কেন্দ্রে সাক্ষরতা পাঠের প্রথম ধাপে চলত এই চিত্র চর্চা। পরবর্তী ধাপে আসত—চিত্রে যা আমরা দেখছি তা কি কেবল চিত্রেই সীমাবদ্ধ না আমাদের জীবনেও ঘটে? সাথে সাথেই উপস্থিত পড়ুয়াদের জীবনের নানা দুঃখ যন্ত্রণার কথা তাদের মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসত। তাদের কী সমস্যা, কেন ইত্যাদি। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার কথা এবং বিভিন্ন উপায়ও আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসত। যেমন একবার এক সমস্যা হিসেবে বেরিয়ে এল তাদের গ্রামের কাঁচা রাস্তার কথা। অনেক অসুবিধা, ভ্যান টানতে জান কয়লা, বর্ষায় চলা দায়, বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না। কিন্তু কী করা যায়? একটা উপায় আছে—পঞ্চায়েত সদস্যকে জানানো। কিন্তু কে জানাবে, কীভাবে জানাবে? উত্তর এল— একটা লিখিত আবেদন করে একসাথে জানাতে হবে। কিন্তু কে লিখবে? এবারে বোঝা গেল নিজেদের দুর্বলতার কথা। কারণ নিজেদের সমস্যার কথা নিজেদেরই বুঝতে যেমন হয়, সেটা নিয়ে লড়তেও হয় নিজেদেরই। একের সমস্যা অন্যে লড়ে মেটাতে পারে না। সেই পাওয়ায় আত্মমর্যাদা আসে না। সেটা আর

এক যন্ত্রণা। সব পেয়েও মন ভরে না। কারণ, আমার অধিকার আমি অর্জন করিনি। তাই হারানোর ভয় থাকে। আর হারিয়ে গেলে কীভাবে ফেরত পাব জানা থাকে না। যাই হোক, এইসব সাতপাঁচ-এর মধ্যে পড়ুয়ারা উপলব্ধি করতে শুরু করে লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনের কথা। সেবক গ্রামেরই অধিবাসী সুতরাং রাস্তাটি তারও প্রয়োজন। সে এক সময় বলে— আমি অবশ্য দরখাস্তটা লিখতে পারি কিন্তু সকলকে সই করতে হবে। সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন কিন্তু সম্মতিও জানালেন। তখন চটপট নাম সই শিখে নেবার তাগিদ।

দরখাস্ত লেখা হল, স্বাক্ষর হল, একসাথে জমা দেওয়া হল। কিছুদিন পর সেই কাঁচা রাস্তায় মোরাম পড়ল কারণ পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে অনেক কিছু অদল-বদল হয়ে যেতে পারে। আর সেটা যদি গোটা কুড়ি হয় তবে চিন্তা তো থাকেই। সেই প্রথম রাস্তায় মোরাম পড়ল।

লেখাপড়া শেখা ও উন্নয়নকে আলাদা করে দেখার মধ্যে বড় ফাঁক বা ভুল আছে বলাই যায়। লেখাপড়া রইল একদিকে আর উন্নয়ন অন্যদিকে—এই ধারণার মধ্যে কোনোটাই এগিয়ে যায় না। না লেখাপড়া, না উন্নয়ন। লিখিত পাঠে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর পাঠ, পর্যালোচনা, প্রয়োগ না ঘটলে সাক্ষরতা অর্থহীন।

ক্রমে ক্রমে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠল একটি স্থানীয় উন্নয়ন কেন্দ্র যেখানে পড়াশোনা, গান, নাটক, কৌতুক যেমন হয় তেমন গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা—অল্প বয়সে বিয়ে, বারবার কন্যা সন্তানের জন্ম, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, নানা ক্ষতিকারক প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাও হয়। এসব চলতেই থাকল।

নিশ্চয়ই কিছু মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল।

একবার গ্রামের কিছু লোক সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল—যদি সাহস থাকে তো আমাদের গুনিনের সামনে বসো, আমাদের গুনিন দূর থেকে মন্ত্র পড়ে জীবন নাশ করবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বালিগেড়িয়া গ্রামের ঘটনা। ওঝা গুনিন সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের অগাধ বিশ্বাস—এরা অসাধ্য সাধন করতে পারে। তাই তাদের সঙ্গে কেউ লাগতে যায় না। খানিকক্ষণ সবাই চুপ। হঠাৎ একদল যুবক বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল—আমরা রাজি। গুনিন পক্ষ বলল—ভেবেচিন্তে কথা বল, ছেলেখলা নয়, জীবন মরণের খেলা। মরে গেলে দায় তোমাদের। মুখের কথা নয়। স্থানীয় কয়েকজন বয়স্ক মানুষ সাবধান করে বলল—অত সাহস দেখাসনে অখিল, এসব ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। যুবকেরা ছাড়ার পাত্র নয়। তারাও বুক ঠুকে, বুকে কয়েকটা চাপড় মেরে বলল—রাখো তোমাদের ওঝা গুনিন, আমরা রাজি, তবে শর্ত এই, গুনিন বা অন্য কোনে সাগরেদ আমাদের ছুঁতে পারবে না বা কিছু খাওয়াতে পারবে না। গুনিন পক্ষ বলল— তাই হবে। দিনক্ষণ ঠিক হল। গ্রামবাসী হাজির। মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত যুবকদল, কে আগে গুনিনের সামনে বসবে তাই নিয়ে যখন হুড়োহুড়ি, খবর এল গুনিন আসবে না। চারিদিকে গুঞ্জন উঠল যারা তামাশা দেখতে এসেছিল, হতাশ হল। যুবকদল হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠল, তাদের সঙ্গে আরও গ্রামবাসী। যুবকদের উল্লাস ভোলার নয়। 'ওরা হেরে গেছ, এতদিন আমাদের মিথ্যে ভয় দেখিয়ে আসছিল' — এই ছিল উল্লাসের ভাষা।

পরবর্তীকালে এই কর্মসূচি বন্ধ হয়ে গেল। এই কেন্দ্রের সেবক যিনি ছিলেন তিনি মাসিক ৬০ টাকা হিসাবে একটি ভাতা পেতেন। কেন্দ্রে দশ জন পিছু একটি হ্যারিকেন ও কেরোসিনের জন্য মাসে ৩০ টাকা। পড়ুয়াদের প্রত্যেকের জন্য দেওয়া হত একটি করে বই, খাতা ও পেন্সিল। এই কর্মসূচির চরিত্র দীর্ঘমেয়াদী ছিল না। তাই মেয়াদ শেষ হলে কেন্দ্রে আর আলো জ্বলল না।

সমস্যা আর কি ছিল না? অবশ্যই। এই কেন্দ্রগুলির ভবিষ্যৎ কী ছিল? একে কি আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল? ইত্যাদি বহু প্রশ্ন। কোনো একটি জায়গায় মানুষ জড়ো হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে, অধিকারের প্রশ্ন উঠছে। এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে প্রমাদ গুনছে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তি। তাদের একটা তীক্ষ্ণ নজর ছিলই। অন্যদিকে এই প্রশিক্ষক বা সেবকদের একটা নেতৃত্বদানের ক্ষমতাও ছিল, ছিল সমাজে নিজেকে নিযুক্ত করার ইচ্ছা। কিন্তু হাতের কাছে সংগঠন বলতে রাজনৈতিক দল, তাই ধীরে ধীরে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালকদের অনেকেই মিশে গেল স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে যদিও এই কর্মসংস্থানহীন বেকার যুবক-যুবতীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কী হবে তা নিয়ে যে খুব ভেবেছিল তা মনে হয় নি।

আরো বাধা ছিল—অনুসন্ধান করা যেতে পারত হয়ত, হয়নি।

অতঃপর— ক র কর/ খ ল খল/ঘ ট ঘট।

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।

শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।।

উমা

প্রযুক্তি নির্ভর অনুবাদ বনাম যান্ত্রিক অনুবাদ

ভূপতি চক্রবর্তী

কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে প্রায় আঁতকে উঠলেন প্রবীণ অধ্যাপক। কপালে হাত দিয়ে মাথাটা কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়ে পাশে বসা তার তুলনায় নবীন সহকর্মীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। নবীন অধ্যাপকের চোখ মুখেও ফুটে উঠেছে লজ্জা তথা বিব্রত ভাব। মৃদু স্বরে তিনি বললেন, 'না, সমীরদা এভাবে হবে না, নিজেদেরই বোধহয় করতে হবে, তবে কাজটা বেশ বড় হয়ে গেল।'

সমীরবাবু কম্পিউটারের মনিটর থেকে চোখ সরাতে পারছিলেন না, কথা বললেন না। মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তার মনে হচ্ছিল আগে যেভাবে কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়া হাতে লিখে ইংরাজি ও বাংলায় প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন, প্রেস ছাপতে নিত, তিনি প্রুফ দেখতেন— সেই দীর্ঘ পদ্ধতিই কি স্বস্তির ছিল? কম্পিউটার ব্যবহার করে ইংরাজি টাইপ করার ব্যাপারটা অবশ্যই সুবিধার, ইচ্ছেমত পরিবর্তন একটা ডকুমেন্টে করা যায়। এখন বাংলায় টাইপও মন্দ হচ্ছে না, বিশেষ করে যারা সড়গড় হয়ে উঠেছেন তাঁদের কাছে। ভালো সফটওয়্যার পাওয়া যাচ্ছে। তবে সময় কিছু বেশি লাগছে। কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কি? প্রশ্নপত্রের মতো গোপনীয় বা কনফিডেন্সিয়াল বিষয় তো কেউ বাইরের কারো কাছে টাইপ করতে দেওয়া যায় না। আর তা ছাড়া সেই বাংলা অনুবাদ বা বাংলা ভাষ্য তৈরি করে নিজের হাতে লিখতে তো হবে। তারপরে আসছে টাইপের প্রশ্ন।

যে সব পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ইংরাজি ও বাংলায়, কিংবা ইংরাজি ও আর একটি ভারতীয় ভাষায় করতে হয়, বছর পনেরো আগে তার দুটিই শিক্ষক বা অধ্যাপকেরা হাতে লিখে করতেন। বাংলার ক্ষেত্রে বলা যায় যে অধ্যাপকেরা অনেক সময়ই বিজ্ঞানের প্রশ্ন করতে গিয়ে আগে ইংরাজি ও পরে তার বঙ্গানুবাদ করতেন। ধীরে ধীরে প্রশ্ন কম্পিউটারে ইংরাজিতে টাইপ করা শুরু হল। যদিও প্রশ্নপত্রে চিত্র বা গাণিতিক ব্যঞ্জনা লেখার কাজটা খুব সহজ হত না। অনেক সময় প্রশ্নপত্রে কিছুটা জায়গা ছেড়ে রাখা হত, তারপর সেখানে ঐ চিত্র বা সমীকরণ লিখে দেওয়া হত, প্রশ্নপত্রের প্রিন্ট আউট নেওয়ার পর। এখন অবশ্য সরাসরি চিত্র দিয়ে দেওয়ার সুযোগ অনেক বেড়েছে। তাই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে এবং সকলেরই সুবিধা হয়েছে। বাংলা লেখার সফটওয়্যার, বিভিন্ন ফন্ট এবং নানা ধরনের ডকুমেন্টে তাদের যুক্ত করা অনেক সহজ হয়েছে। এখন একটি প্রশ্নপত্র ইংরাজিতে তৈরি করে তার বাংলা অনুবাদ করে টাইপ করতে হচ্ছে না, তার জন্য চলে এসেছে অন্য সাহায্যকারী 'বন্ধু'— যাকে বলা হচ্ছে অনুবাদক বা ট্রান্সলেটর। প্রশ্নপত্রের ইংরাজি ভার্সান থেকে সে দিব্যি দিয়ে দিচ্ছে বাংলা তর্জমা। এমনকি বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রেও।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনিতে বিগত কিছু বছর ধরেই স্নাতক স্তরের যে প্রশ্নপত্রগুলি বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তৈরি করা হয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেই প্রশ্নপত্রের ইংরাজি ভার্সানটি তুলনায় সাবলীল, স্পষ্টতর এবং তার বাঁধুনি বেশ আঁটোসাটো। একই প্রশ্নের বাংলা ভাষ্যে এই সবগুলিরই অভাব রয়েছে। যে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা কেবল বাংলা ভাষায় প্রশ্নপত্র তৈরি করেন তাদের বাংলা তুলনায় ভালো হওয়ার কথা। তবে দুঃখের বিষয়, নানা কারণে শিক্ষকেরা নিজেরা নিজেদের ভাষায় প্রশ্নপত্র তৈরি করতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। হয়ত প্রশ্নের ভাষা ভিন্ন হলে তার 'সিলেবাস বহির্ভূত' তকমা জুটবে। তাই তাদেরও খানিকটা ঝোঁক থাকে বইয়ের অনুশীলনী বা অন্যত্র থাকা প্রশ্ন তুলে দেওয়ার। অথচ বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে কিছুটা পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ কিন্তু রয়েছে।

আমরা জানি যে, কোন ভাষায় আমার কতটা ব্যুৎপত্তি আছে তা দেখার জন্য চারটি ধাপ চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রথমটি হচ্ছে ভাষাটা বোঝা (understand) অর্থাৎ ঐ ভাষা কেউ বললে আমি তার অর্থ ধরতে পারি কিনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমি ভাষাটি বলতে (speak) পারি কিনা। এই দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, কারণ আমরা অনেক ভাষার ক্ষেত্রে এই দুটিই অতিক্রম করতে পারি না। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে কোনো ভাষাকে এই দুটি পর্যায়ে আয়ত্ব করতে হলে সেই ভাষার লিপি, বা সেই ভাষাটি লিখে আমার চোখের সামনে

ধরলে কেমন লাগবে তা পর্যন্ত জানার দরকার নেই। তাই একেবারে সীমিত অক্ষরজ্ঞান নিয়েও এইভাবে কোনো ভাষার এই দুটি পর্যায় অর্থাৎ বোঝা ও বলা আয়ত্ব করা সম্ভব। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছেন বেশ কিছু পর্যটন স্থলে বিদেশী পর্যটকদের নানা ধরনের ভাষায় অনর্গল বলে যাচ্ছে কিছু গাইড। এই গাইডদের অনেকেরই হয়ত ঐ ভাষার লিপির সঙ্গে পরিচয় নাও থাকতে পারে। তাই তারা হয়ত ভাষাটা পড়তে বা লিখতে পারবেন না। তবে তারা অবশ্যই দক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

ভাষা শিক্ষার পরবর্তী দুটি পর্যায় কিন্তু বেশ কঠিন। এই দুটি মধ্যে রয়েছে পড়া বা পাঠ করবার ক্ষমতা (Reading) এবং শেষ বা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে Writing বা লেখা অর্থাৎ ঐ ভাষাটিকে তার ব্যবহৃত লিপি ব্যবহার করে আমি লিখতে পারছি কিনা। এক্ষেত্রে আমাদের পরিচিত লিপি (ধরা যাক রোমান) ব্যবহার করে লিখলে চলবে না কিন্তু। আজকের দিনে আমাদের ফোনে নানা ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করে বহু মেসেজ আমরা পাঠাই ও পেয়ে থাকি। লক্ষ্য করবেন, এই মেসেজগুলোতে অনেকেই ইংরাজি বা রোমান হরফ ব্যবহার করে বাংলায় মেসেজ পাঠান। এটা অবশ্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ঐ ভাষাভাষী মানুষেরাই করে চলেছেন। তাই এই প্রক্রিয়া সারা ভারতেই চালু। অতএব কেবল বাংলা নয় অন্য ভারতীয় ভাষাগুলিতে মেসেজ এভাবেই লেখা হচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় ভাষার লিপি ব্যবহার কমে আসছে কিনা কিংবা ভাষাগুলি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ছে কিনা সে বিষয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। কারণ এভাবে লিখে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রাপককে কিছু কাজ অবশ্যই হচ্ছে।

ফিরে আসা যাক গোড়ার কথায়। যে প্রবীণ অধ্যাপক তার ইংরাজিতে করা একটি প্রশ্নের যন্ত্রকৃত বাংলা অনুবাদে একেবারে মুষড়ে পড়েছিলেন। কী সেখানে ছিল। মাধ্যমিক পর্যন্ত আমরা সকলেই ভৌতবিজ্ঞান পড়েছি, সেখানে খুব প্রচলিত ও বহুল আলোচিত একটি বিষয় অর্থাৎ অভিকর্ষের বা পৃথিবীর টানে কোনো বস্তুর মাটির দিকে নেমে আসা। নানা প্রশ্নে ও গাণিতিক প্রশ্ন প্রায়শই শুরু হয় এই বাক্য-বন্ধ দিয়ে, 'অভিকর্ষের টানে বাধাহীনভাবে (বা মুক্তভাবে) পতনশীল একটি বস্তু ...' ইত্যাদি। ইংরাজিতে এই প্রশ্ন শুরু হয় খানিকটা বাধা গতে যার সঙ্গে ভৌতবিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা খুবই পরিচিত। বলা হয়, 'A body falling freely under gravity ...' ইত্যাদি। আমার সহকর্মী বন্ধু ঐ অধ্যাপকেরা বস্তুত এই ভাষায় ইংরাজিতে প্রশ্নটা করে ভেবেছিলেন google translator-এ বাংলা তর্জমাটা সেরে নেবেন। কি প্রত্যাশিত আগেই লেখা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া গেল কী? কম্পিউটারের পর্দায় ঐ বাক্যাংশের বাংলা তর্জমা এলো 'বিনামূল্যে পতিত একটি লাশ মহাকর্ষের টানে' ...। বোঝা যাচ্ছে কেন প্রবীণ অধ্যাপক সমীরদা কপালে হাত দিয়েছিলেন।

কোনো যন্ত্র-অনুবাদক বা ট্রান্সলেটারকে দূষবার আগে একবার একটু খুঁটিয়ে বিষয়টা দেখে নেওয়া যাক। Freely কথার বেশ কতগুলি বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে—মুক্তভাবে, বাধাহীনভাবে, বিনামূল্যে বা বিনা মাশুলে সবকিছুই freelyর বাংলা প্রতিশব্দ। দেহ, শরীর, মূল অংশ (body of the letterএর body), মৃতদেহ এমনকি 'লাশ'ও হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে এখানে যান্ত্রিক অনুবাদক কোন দুটি শব্দকে নিয়ে আমাদের হাতে তুলে দেবে। তার ওপর falling রয়েছে, বাংলায় যা হতে পারে পতনশীল (সব থেকে গ্রহণীয় শব্দ এক্ষেত্রে), পতিত (চলতে পারে) নেমে আসা (চলতে পারে) ইত্যাদি। আর মনে রাখতে হবে পৃথিবী ও অন্য কোনো বস্তুর মধ্যেকার আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলা হয়, মহাকর্ষ নয়। কোন কোন শব্দগুলি নিয়ে বাংলা করলে সবথেকে ভালো হবে। এক্ষেত্রে সেই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দ অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে, তাকে হতে হবে ছাত্রদের পরিচিত ভাষা। আমাদের দেখতে হবে কোন বাক্যবন্ধের মধ্যে দিয়ে এই প্রবলেম বা অঙ্ক কিংবা এই ভৌত অবস্থার বর্ণনা ছাত্রছাত্রীরা শুনতে সবচেয়ে বেশি অভ্যস্ত। এক অর্থে বলা যায় এই ভাষা, বই বা প্রশ্নপত্রের মান্য ভাষা বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হওয়া চাই।

আর এখানেই অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে প্রশ্নকর্তা বা শিক্ষকের বাংলা ভাষার বা ক্ষেত্রবিশেষে ইংরাজি ভাষার জ্ঞান। কারণ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যে, একটি ভালো প্রশ্ন বাংলায় পাওয়া গেছে বা শিক্ষক যিনি বাংলায় সচরাচর চিন্তা করতে অভ্যস্ত সেই ভাষায় তিনি তৈরি করেছেন। এবার যদি এই প্রশ্নের ইংরাজি ভাষ্য প্রয়োজন হয় এবং শিক্ষক যদি ট্রান্সলেটারের সাহায্য নেওয়া নিরাপদ মনে করেন তাহলে আবার সেই সতর্ক থাকার প্রশ্ন উঠে আসছে—আবারও না প্রশ্নকর্তাকে মাথায় হাত দিতে হয়!

বাংলা ভাষায় তর্জমা করার সময় যন্ত্রের আর একটা অসুবিধা হচ্ছে, সেই বাংলা ভাষা কোথাকার? ভারতের না

বাংলাদেশের? দু দেশের বাংলায় নানা কারণে শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগ, বাক্যের বিন্যাস ও পারিপার্শ্বিক ভাষা থেকে ঢুকে পড়া শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে একটা পার্থক্য ক্রমাগত স্পষ্টতর হচ্ছে। ভারতে বাংলাভাষী আমরা বহুভাষী দেশের একটি অঙ্গরাজ্য। বাংলাভাষী মানুষ ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ছেন। একটা দুটো হলেও ধীরে ধীরে তাদের কথ্য ভাষায় অন্য ভাষার শব্দ ঢুকছে। টিভির হিন্দী সংবাদ বা হিন্দী ভাষায় অজস্র অনুষ্ঠান শুনতে আমরা অভ্যস্ত। সুবিধাজনক শব্দ পাওয়া গেলে প্রথমে তা কথ্য ভাষায় চট করে ঢুকে পড়ছে। তাছাড়া ইংরাজি শব্দের বহুল প্রয়োগে বাংলায় ভারতীয় ভাষার উপযুক্ত শব্দ না পাওয়া গেলে দিব্যি কাজ চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইংরাজি শব্দ দিয়ে। আমার এক্ষুনি এরকম কয়েকটি শব্দ মনে আসছে যাদের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ আমি পাইনি। যেমন, ইন্টারেস্টিং, চ্যালেঞ্জিং ও চ্যালেঞ্জ ফ্যাক্টর, ম্যাসিভ (massive), কোয়ান্টাম [নানা বিষয়ে যেমন quantum of work, quantum of money প্রভৃতি] এবং অবশ্যই বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বহু শব্দ ও বাক্যবন্ধ। ইংরাজি থেকে নেওয়া এইসব শব্দ প্রয়োগে প্রায়শই স্বস্তি মেলে।

এই সবকিছুর সঙ্গে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি আমাদের বৃহদংশ মানুষের হাতে হাতে ঘুরছে।

ফোন আমাদের সকলকেই কম-বেশি লেখক করে তুলেছে। অজস্র উপাদান 'অগ্রসিত' মানে ফরওয়ার্ড (forward) করার সঙ্গে লিখেও ফেলছি অনেক কিছু। লেখা হচ্ছে ইংরাজিতে, ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় লিপিতে বাংলা লেখা। আর এই লেখা বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র বা উত্তরপত্রের নয়। নয় কোনো সাহিত্যকীর্তির। তাই সেই ভাষায় লেখা হয়ে যাচ্ছে অজস্র কথ্য শব্দ। ভিন্ন ভাষার (মূলত হিন্দী ও ইংরাজির উপযুক্ত শব্দ যা ভাব প্রকাশে সহায়ক) শব্দ বা বাক্যাংশ এখন শুধু বলছি না লিখছিও। স্বভাবতই ছাত্রসমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে তার প্রতিফলন আসছে উত্তরপত্রে তা যে বিষয়েরই হোক না কেন।

ভাষার বহমানতার কথা সর্বজনস্বীকৃত। ভাষা সমৃদ্ধ হয় অন্য ভাষার শব্দ গ্রহণে ও তার প্রয়োগে। এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইংরাজি অভিধানের বিখ্যাত প্রকাশকেরা যখন অভিধানের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন, তখন সেখানে একটি বিশেষ তালিকা রাখেন। ঐ তালিকায় রাখা হয় সেইসব বিদেশি শব্দ যা পূর্ববর্তী সংস্করণের পরে ইংরাজি ভাষায় মান্যতা পেয়েছে, অর্থাৎ বহুলভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আমাদের সমস্যার একটা ভিন্ন মাত্রা তৈরি হয়েছে। একদিকে বহু তৎসম শব্দের ব্যবহার এখন কমে আসছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের আলোচনায় সেইসব শব্দ, তা যতই ব্যঞ্জনাময় হোক না কেন পড়ুয়ারা তা কিন্তু তেমন পছন্দ করছে না। আবার একেবারে কথ্য ভাষা বা অন্য ভাষা থেকে আহৃত শব্দ যা মোবাইল ফোনের নানা অ্যাপে দিব্যি ঠাঁই পাচ্ছে তাকে এই পড়াশোনার আঙিনায়, অর্থাৎ বইতে, প্রশ্নপত্রে বা উত্তরপত্রে স্থান দিতে আমাদের দ্বিধা বিশেষভাবে কাজ করছে। পুরনো মান্য ভাষাকে ঠিক ছেড়েও দিতে পারছি না, আবার তাকে খুব জোরালো ভাবে গ্রহণ করে পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শক্ত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে। মনে হয় বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে এবং বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ট্রান্সলেটারকে দোষ না দিয়ে ভাষার রাশটা নিজেদের হাতে রাখতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। ট্রান্সলেটারের মতো একটা সাহায্যকারী প্রযুক্তিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, তবে মূল ভাষাটিও ভালোভাবে জানতে হবে। যান্ত্রিক ট্রান্সলেটার একেবারে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কাজ করে, কখনও তা আমাদের সন্তুষ্ট করে, কখনও তা জন্ম দেয় প্রভূত বিরক্তির। এই বিষয়টা মাথায় রাখলে আমরা প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব ভাষা বিষয়ে নিজেদের দক্ষতা দিয়ে। আর তা না হলে কিছু কিছু লেখা দেখে আমরাই বলে উঠব, 'আরে এ তো ট্রান্সলেটারে ফেলে করে দিয়েছে, একটুও খাটে নি।' সংস্কৃত অনুবাদ হয়ত প্রতিটি বাক্যে ধরা পড়ে না। কিন্তু সেই অনুবাদ যদি পাতা ভরা হয় এবং তার ভাষা পরিমার্জনা না করে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে ট্রান্সলেটার হয়ত নিছক হাসির খোরাক যোগাবে। কিন্তু আমরা চিহ্নিত হয়ে যাব কিছু নিন্দাসূচক বিশেষণে। সেগুলি না হয় উহ্যই রাখলাম। **উমা**

হোমিওপ্যাথির গবেষণা

চিকিৎসার অন্ধগলি ও অস্তিত্ব রক্ষার অপসারণ

সুব্রত রায়

জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের মানুষ। তিনি প্রচলিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েও নানা কারণে এই ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে হোমিওপ্যাথি নামে একটি নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির সূত্রপাত করেন। হোমিওপ্যাথির একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এ নিয়ে কোনও আলোচনাই হ্যানিম্যানের সময় ও তাঁর নিজস্ব চিন্তন প্রক্রিয়াটিকে এড়িয়ে করা সম্ভব নয়—হোমিওপ্যাথির মোদ্দা গতিপথটি হ্যানিম্যান গোড়া থেকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হ্যানিম্যান-পরবর্তী হোমিওপ্যাথির বহিরঙ্গে অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটলেও এর মূল কাঠামোটি কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণই থেকে গেছে, যে কাঠামোটি অষ্টাদশ শতকীয় চিকিৎসার অনুষঙ্গে হ্যানিম্যান নির্মাণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসচর্চায় ব্যক্তিগত আগ্রহ না থাকলে আজকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন স্নাতক সাধারণত ভেসালিয়াস বা সিডেনহ্যামের জীবনী ও সময়কাল অধ্যয়ন করেন না, কিন্তু হোমিওপ্যাথির শিক্ষার্থী ওভাবে হ্যানিম্যানকে ইতিহাসের পাতায় আটকে রাখতে পারবেন না। কাজেই, হোমিওপ্যাথির গবেষণা নিয়ে লিখতে বসে আপাতত দুশো বছর পিছিয়ে যেতে হচ্ছে।

হ্যানিম্যানের সময়ে চিকিৎসা যেখানে দাঁড়িয়ে : হ্যানিম্যানের সময়ে মানবশরীরের অ্যানাটমি-ফিজিওলজি সম্পর্কিত জ্ঞানগম্যি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর না হলেও, রোগ কেন হয় এবং কোন প্রক্রিয়ায় রোগমুক্তি ঘটে—এই প্রশ্নে এমন কোনও তত্ত্ব ছিল না, যার সাহায্যে ওই জ্ঞানকে ঠিকমতো কাজে লাগানো যায়। গোটা পৃথিবীতেই নানান চেহারায় ভারসাম্যহীনতার তত্ত্ব এই প্রশ্ন দুটির উত্তর জোগাত। এই তত্ত্বে শরীরের নানান বাস্তব বা কাল্পনিক উপাদানের ভারসাম্যের অভাবকে রোগের কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল, চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছিল ওই ভারসাম্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। ভারতে যেমন বায়ু-পিত্ত-কফ, কিংবা চিনে ইয়াং-ইন্, তেমনি ইউরোপে দু-হাজার বছরের পুরোনো রসতত্ত্ব (doctrine of humours) অনুযায়ী চারটি 'রস' (রক্ত, কফ, কালো পিত্ত, হলুদ পিত্ত)-এর ভারসাম্যের উপরেই রোগারোগ্য তত্ত্ব আস্থা রেখেছিল। বলা বাহুল্য, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা সত্যিকারের জ্ঞানের সঙ্গে এই অনুমাননির্ভর তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক ছিল না। অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান ও তত্ত্বের মধ্যেকার এই শূন্যস্থান অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, এই সময়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কিছু চমকপ্রদ উন্নতি ঘটে, যা প্রকৃতিকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা এবং তার সাহায্যে অভাবনীয় সব শক্তিশালী যন্ত্রপাতি বানাবার ক্ষমতা এনে দিয়েছিল। বিগত শতকে নিউটন বলবিদ্যা ও মহাকর্ষের যে মৌল নিয়মগুলি সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, এ শতকে লাগ্রাঁজ-লাপ্লাস-পয়সনের মতো প্রতিভাধর গণিতজ্ঞেরা তার গাণিতিক কাঠামোকে পোক্ত ও সুসম্পূর্ণ করে তোলেন। রসায়নেও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মধ্যে ওজনগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এভাবে ল্যাভয়শিয়েঁর মতো বিজ্ঞানীর হাত ধরে আদিম 'অ্যালকেমি' থেকে প্রকৃত বিজ্ঞানে উন্নীত হতে পেরেছিল। তেমনি চিকিৎসাতেও কোনও মৌলনীতি আবিষ্কার সম্ভব কিনা, যা দিয়ে মানবশরীরেরও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়ে ওঠে— তা নিয়ে অষ্টাদশ শতকে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অ্যানাটমি-ফিজিওলজির সত্যিকারের তথ্যের সঙ্গে নানান অনুমান যোগ করে এই সময়ে একের পর এক রোগতত্ত্ব গজিয়ে উঠতে থাকে। পেশিতত্ত্ব, রক্ত, কোশ, স্নায়ু ইত্যাদি নানা বিষয়কে ঘিরে গড়ে ওঠা অসংখ্য আজগুবি ও পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ইউরোপকে হাতুড়েপনার সুবর্ণযুগে পরিণত করে। কার্যত ভারসাম্যহীনতার পুরোনো তত্ত্বই নতুন নতুন মোড়কে উত্থাপিত হয় এবং চিকিৎসায় রক্তমোক্ষণ, কোষ্ঠশোধন ইত্যাদি বিষয়গুলির বৈধতা প্রায় আগের মতোই বজায় থাকে। নতুন যা হয়, ওষুধ আবিষ্কারের হিড়িক পড়ে যায়। ডরোথি ও রয় পোর্টার লিখেছেন ঃ

[E]veryone recognized that medical art was difficult

and the empire of pain and death unshaken; because no single group of doctors could reliably shopped around. ...The sick people shopped around because there was no monopoly, and no single, unequivocal 'best buy', no scientific medicine palpably effective in restoring the ailing and failing to the pink of health. They took whatever medicine was to hand (Porter & Porter 1989:27)

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ব্রিটেনের ওষুধ-বাজার থেকে আমরা কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি ঃ Dr. James Powder/ Hooper's Female Pills/Ruston's Pill for the Rheumatism/ Royon's Ointment for the Itch.../Swinfen's Electuary for the Stone and Gravel/ Spirits of Scurvy Grass.../Tasteless Ague and Fever Drops/Vandour's Pills, for Nervous Complints/Special Purging Remedy for Venereal Diseases, by Wessels (Porter:45-46)

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বাহিত হয়ে কিংবা দেওয়ালে দেওয়ালে শোভিত হয়ে এইসব 'অত্যাশ্চর্য' ওষুধের খবর সাধারণের কাছে পৌঁছে যেত। ব্রিটেনে দশ বছরে ১৬ লক্ষেরও বেশি জেমস্-এর পাউডার বিক্রয়ের নমুনা আছে। ফার্মাসিস্টরা যে ওষুধ বানাতেন, তা ছিল একাধিক উপাদানের মিশ্রণ; ওষুধের মধ্যে উপাদানগুলির পরিমাণের কোনও নির্দিষ্টতা বজায় থাকত না। বাজারে 'নিজের চিকিৎসা নিজে করুন' গোছের বইপত্রের কোনও অভাব ছিল না। চিকিৎসকরাও নিজেদের নানান কায়দায় উপস্থাপিত করতেন, কখনও কখনও সর্বরোগহর ওষুধের মতো 'সর্বরোগ সারানোর কারিগর'রূপেও তাঁদের আবির্ভূত হতে দেখা যেত। রয় পোর্টার তাঁর *Health for Sale:qyackery in England 1660-1850* পুস্তকে জনৈক চিকিৎসকের একটি চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন হাজির করেছেন— "High German Doctor, who by his great study, and constant practice in several parts of the world, as well in Princes' Courts, as in hospitals and war-like expeditions hath obtained such a physical method, as to cure all external and internal distempers (if curable) (Porter:98)."

সেকালের বিখ্যাত বিজ্ঞানীরাও কখনও কখনও এসবের প্রলোভন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। এমনকি, ১৮০১ সাল নাগাদ, যখন হোমিওপ্যাথির মূল ধারণাগুলির লক্ষণ তাঁর লেখাপত্রে ফুটে উঠতে শুরু করেছে, স্বয়ং হ্যানিম্যান শরীরের অভ্যন্তরীণ পুরনো ক্ষত (ulcer) সারানোর কাজে উপযোগী একটি রাসায়নিক আবিষ্কারের দাবি করে বসেন। 'Alkali Pneum' নামের এই 'ওষুধ'-টিকে স্থানীয় দালালের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু এর উপাদান সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ফাঁস হয় যে, রাসায়নিকটি অজানা কোনও পদার্থ নয়, সেটি ছিল রসায়নবিদের অতি-চেনা বোরাক্স! তড়িঘড়ি হ্যানিম্যান ওষুধ বিক্রির সমস্ত অর্থ ফেরত দেবার ব্যবস্থা করেন এবং এই ঘটনাকে 'রসায়নের সৎ-ত্রুটি' বলে সাফাই দেন (Cook 2018:87-88, King 1958:172)।

হ্যানিম্যানের চিন্তায় হোমিওপ্যাথির গবেষণা : প্রচলিত চিকিৎসার এই ছন্নছাড়া দশাকেই হ্যানিম্যান 'অ্যালোপ্যাথি' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি ওষুধের পরিমাণ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, রোগ সারার সাথে ওষুধের পরিমাণের সম্পর্ক কী? তা কি সমানুপাতিক? কেন একই প্রেসক্রিপশন নিয়ে বিভিন্ন ফার্মাসিস্টের হাতে তুলে দিলে স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে আলাদা আলাদা বস্তু ফেরত পাওয়া যায়? বলা বাহুল্য যে, হ্যানিম্যানের সময়টা এই প্রশ্নের উত্তর দেবার উপযোগী ছিল না। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে, পীতজ্বর মোকাবিলায় 'সূক্ষ্মমাত্রায়' বেলেডোনা ব্যবহারের একমাত্র নিজস্ব অভিজ্ঞতাটিকে সম্বল করে, হ্যানিম্যান রোগ সারার সাথে ওষুধের পরিমাণের সম্পর্ককে স্বতঃসিদ্ধভাবে ব্যস্তানুপাতী বলে সাব্যস্ত করেন। অন্যদিকে, উইলিয়াম কালেনের মেটিরিয়া মেডিকার জার্মান অনুবাদ করতে গিয়ে হ্যানিম্যান সিঙ্কোনা দিয়ে জ্বর সারার কারণ অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তিনি নিজে সুস্থ অবস্থায় সিঙ্কোনার নির্যাস খেয়ে শরীরে ফুটে ওঠা উপসর্গগুলি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত নেন যে, এই 'কৃত্রিম জ্বর' তৈরি করে। কিছুকালের মধ্যেই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় যে, এই 'কৃত্রিম জ্বর' সত্যিকারের জ্বরকে দমন করে বলেই নাকি সিঙ্কোনা জ্বরনাশক হিসেবে কার্যকর। এভাবে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির দুটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বে উপনীত হন: (১) সদৃশতার নিয়ম : সুস্থ শরীরে কোনও ভেষজ সেবনে যে যে উপসর্গ দেখা দেয়, ওই লক্ষণসমষ্টি কোনও রোগে প্রকাশিত হলে ভেষজটি তা সারাতে পারবে; (২) সূক্ষ্মতার নিয়ম: ওষুধে ব্যবহৃত মূল ভেষজের পরিমাণ যত কমতে থাকবে, ততই তার শক্তি বাড়তে থাকবে। এইভাবে অত্যল্প কিছু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে হ্যানিম্যান নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি গড়তে মনস্থ করেন। মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের বৈশিষ্ট্যবাচক তত্ত্ব প্রণয়নের ঝোঁক তাঁর উপরেও চেপে বসেছিল।

পরবর্তীকালে হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মেটিরিয়া মেডিকা নির্মাণ করেন, যেখানে বিভিন্ন ভেষজের ক্ষেত্রে সুস্থ মানবশরীরে দৃষ্ট উপসর্গগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নথিভুক্ত করা হয়, প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয় 'প্রুভিং'। এভাবে একেকটি ভেষজ বিপুল সংখ্যক শারীরিক, মানসিক ও অবিশেষ 'লক্ষণ'-এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, সিঙ্কোনা 'প্রুভিং' করে হ্যানিম্যান ও তাঁর অনুগামীরা ১১৪৩টি উপসর্গ পেয়েছিলেন। কাজেই, হোমিওপ্যাথি প্রয়োগের মৌলিক মডেলটি হয়ে ওঠে এরকম: রোগীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে রোগলক্ষণগুলো জেনে নেওয়া — মেটিরিয়া মেডিকার সাহায্যে 'লক্ষণসমগ্র' মিলিয়ে ওষুধ নির্বাচন— নির্বাচিত ভেষজের হোমিও প্যাথিক দ্রবণের নিদান প্রয়োগ। কিন্তু শরীরে এই ওষুধ কাজ করবে কীভাবে? হ্যানিম্যান বলছেন, রোগ সারানোর উপযোগী পাতলা করা ভেষজের 'প্রেতোপম' (spirit-like) শক্তি কখনই যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয় (Hahnemann 1994:38 [§20])। অর্থাৎ ওষুধ শরীরে প্রবেশ করে কীভাবে ক্রিয়াবিক্রিয়া ঘটায়, তা বুঝে ফেলাটা এক অসাধ্য ব্যাপার। তাহলে হোমিওপ্যাথির গবেষণা কোন পথে এগোবে? ওষুধের ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ে অনুসন্ধান যদি তত্ত্বগতভাবেই অসম্ভব হয়, তাহলে হোমিওপ্যাথির ভবিষ্যৎ গতিপথটি কেমন হবে? হ্যানিম্যান ভাবীকালের হোমিওপ্যাথদের জন্য এর একটা খুবই সহজ উত্তর রেখে গিয়েছেন, তা হল — সুস্থ মানবশরীরে নতুন নতুন ভেষজকে 'প্রুভিং'-এর মাধ্যমে 'লক্ষণচিত্র' সহকারে কেবল মেটিরিয়া মেডিকায় নথিভুক্ত করে যাওয়া। মার্কিন হোমিওপ্যাথ ক্যারল ডানহ্যাম লিখেছেন: The especial direction which our labors should take is determined by the pecularities of our method. We are to increase the number of specific remedies. We are to labor diligently, as our predecessors have done, to increase our materia medica, until we have ascertained the special remedial properties of all substances capable of being used in treating diseases (Dunham 1973:96-97).

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে হোমিওপ্যাথির গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, হ্যানিম্যান নির্দেশিত পথেই এর গবেষণা চালিত হয়েছে। তাত্ত্বিক চর্চার পাশাপাশি হোমিওপ্যাথের নিজস্ব ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা (case study) ও সুস্থ শরীরে নতুন নতুন ভেষজ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষাই এই সময়কার হোমিওপ্যাথিক জার্নালগুলির বিষয়বস্তু। প্রচলিত পদ্ধতির চ্যালেঞ্জ সামলাতে গিয়ে একে কখনও কখনও কার্যকারিতার পরীক্ষায় নামতে হলেও, এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা কোনও দিনই এর নিয়মিত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

দুই সমান্তরাল ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির উদ্ভব: হ্যানিম্যানের জীবদ্দশাতেই হোমিওপ্যাথি জার্মানির সীমানা পেরিয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে পাড়ি জমাতে শুরু করে, এমনকি কিছুকালের মধ্যেই তা সাগর পেরিয়ে সুদূর মার্কিন মুলুকে পৌঁছে যায়। সমকালীন চিকিৎসার অভূতপূর্ব অস্থিরতার মধ্যে, তাত্ত্বিক দিশাহীনতা ও তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া প্রায়োগিক বীভৎসতা সম্বল করে টিকে থাকা চিকিৎসার প্রচলিত কাঠামোর বিপরীতে রোগ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, অনুগ্রতা, সামগ্রিকতা, আধ্যাত্মিকতা, দেশজ ভেষজকে মোলায়েমভাবে আত্মসাৎ করে 'দেশীয়' হয়ে ওঠা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য হোমিওপ্যাথিকে জনমানসে সহজেই আদরণীয় করে তুলেছিল। হ্যানিম্যান আদৌ উপেক্ষণীয় ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিপুল অধ্যবসায়, রসায়নবিদ হিসেবে পরিচিতি, অনুবাদক ও লেখক হিসেবে দক্ষতা তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। সমসাময়িক চিকিৎসা নিয়ে তাঁর তীব্র সমালোচনাগুলি যথার্থ মনোযোগ দাবি করার যোগ্য ছিল। হোমিওপ্যাথি নিয়ে প্রথাগত বিরুদ্ধাচরণের বাইরে চিকিৎসক মহলের কারও কারও দৃষ্টি ওদিকে পড়েছিল। অগণিত অ-বিশেষজ্ঞ বা শখের চিকিৎসা চর্চাকারী যেমন নতুন তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি সংখ্যায় অল্প হলেও, প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ চিকিৎসকদের মধ্যেও বিকল্প ব্যবস্থাকে পরখ করার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল। মূলত শেষোক্তদের উদ্যোগেই হোমিওপ্যাথি ব্রিটেন ও আমেরিকায় প্রচলিত চিকিৎসার সমান্তরাল ও প্রতিস্পর্ধী ব্যবস্থারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ব্রিটেন-আমেরিকার তুলনায় স্বদেশ জার্মানিতে হোমিওপ্যাথির ইতিহাস ততখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি, কেননা জার্মান হোমিওপ্যাথি হ্যানিম্যানের বিভিন্ন মতামত নিয়ে তর্ক-বিতর্কে তাঁর জীবদ্দশাতেই তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটেন-আমেরিকায় সমান্তরাল চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে হোমিওপ্যাথির ইতিহাস ও দুই ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব যেমন প্রচলিত চিকিৎসারশক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলি ফুটিয়ে তুলেছিল, তেমনি হোমিওপ্যাথির ভবিষ্যৎ গতিপথও এই পর্বটিই স্থির করে দেয়। মূলস্রোতের চিকিৎসায় রক্তমোক্ষণ, কোষ্ঠশোধনের মতো যুক্তিহীন ও পাশবিক (১৭৯৯ সালে আমেরিকার প্রথম

রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন ফুসফুসের প্রদাহে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর শরীর থেকে দফায় দফায় রক্ত বের করে নেওয়া হয়, যার পরিণতিতে ওয়াশিংটন প্রাণ হারান) পদ্ধতিগুলি নিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। চিকিৎসা পেশাও ধীরে ধীরে সংহত হয়ে ওঠে, ঊনবিংশ শতকে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। হোমিওপ্যাথির উত্তরোত্তর বেড়ে চলা জনপ্রিয়তা ও তুলনামূলক সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে রোগ সারার পেছনে রোগের নিজস্ব প্রকৃতি ও অনির্দিষ্ট নানা প্রভাবের কথা উঠে আসে। উঠে আসে চিকিৎসার সত্যিকারের কার্যকারিতা নির্ণয়ের প্রশ্ন। বাস্তবে, নতুন শতক ছিল জীবাণুতত্ত্বের আবির্ভাবের কাল। পূর্ববর্তী শতকে জেনারের (১৭৪৯-১৮২৩) টিকা ইউরোপে বহুল প্রচলিত হলেও এর কার্যকারণ জানা ছিল না। এখন পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫) শুধু এর ব্যাখ্যাই দিলেন না, জলাতঙ্কের টিকা আবিষ্কার করেও দেখিয়ে দিলেন। একে একে মানবসভ্যতা পরিচিত হল নানান অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে, তাদের হাত থেকে বাঁচবার রাস্তাও ধীরে ধীরে আয়ত্ত হল। এইভাবে, জীবাণুকে রোগের কারণ হিসাবে শনাক্ত করার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত রোগারোগ্য তত্ত্বের জন্ম হল। মানব সভ্যতা হাতে পেল অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিবায়োটিক। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রচলিত ব্যবস্থা যেমন নিজেকে পালটে ফেলেছিল, তেমনি হোমিওপ্যাথিতেও অনেক বদল আসতে থাকে। প্রথমে হোমিওপ্যাথরা জীবাণুকে রোগের কারণ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল; পরে অবস্থান বদলাতে বাধ্য হয়। ক্রমে প্যাথলজির ভূমিকাও স্বীকার করে নেওয়া হয়। কার্যত, ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথরা কেবল সদৃশ নিয়মকে বজায় রেখে বাদবাকি সব কিছুকেই পাল্টে ফেলেছিলেন। ভুতুড়ে মাত্রার বদলে চালু হয়েছিল স্বল্প মাত্রা, লক্ষণ-সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে (সুস্থ শরীরে ভেষজ প্রয়োগে সৃষ্ট উপসর্গ-চিত্রের সাথে রোগ-লক্ষণকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেলানো) ব্যাপক কাটছাঁট করে নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট উপসর্গে দাঁড় করানো হয়েছিল। শল্যকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিসেপটিক, বেদনানাশক ইত্যাদিকেও স্বাগত জানানো হয়েছিল (Nicholla 1988:104-05))। মার্কিন হোমিওপ্যাথরাও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকাতে অনুপ্রবেশের অল্প কিছুকালের মধ্যেই হ্যানিম্যানের মতবাদ কার্যত ওষুধ বাছাই করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে (Kaufmann 1971:113)। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ও মার্কিন জার্নালগুলিতে নিয়মিতভাবে অস্ত্রোপচার নিয়ে গবেষণা প্রকাশিত হতে দেখা যেত। প্যাথলজিকে মেনে নেওয়ার ফলে বিভিন্ন ভেষজের সাথে প্যাথলজিক্যাল লক্ষণগুলিকে সংযুক্ত করাও আবশ্যিক হয়ে ওঠে, ফলে নতুন নতুন মেটিরিয়া মেডিকার আবির্ভাব ঘটে। ওষুধ বাছাইয়ের জটিলতা কাটতে রেপার্টরি-মন্থনের কষ্টসাধ্য পদ্ধতি এড়িয়ে নানা রকম শর্টকাট রাস্তা খোঁজা শুরু হয়। কিন্তু এভাবে রক্ষণশীলতা বিসর্জন করে টিকে থাকার কৌশলের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল হোমিওপ্যাথির ধ্বংসের বীজ। প্রচলিত চিকিৎসার সঙ্গে এর ফারাক যখন বুজে এল, নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি হিসাবে এর আকর্ষণও অন্তর্হিত হল। ফলে ব্রিটেন-আমেরিকায় নতুন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া আবার উলটো দিকে ঘুরে যায়। বিংশ শতকের শুরুতেই হোমিওপ্যাথির বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি ২২টি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, যেগুলি এর অভিঘাতকে একে একে আধুনিক চিকিৎসাচর্চা কেন্দ্রে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। **(চলবে)**

ঊমা

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

সাধারণ ডাকযোগে কেউ কেউ পত্রিকা পান না বলে অভিযোগ জানান। সরকারি ডাক ব্যবস্থার ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ইদানীং ডাক বিভাগের পরিষেবার মান খারাপ হওয়াতে আমরা স্পিড পোস্টে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা চালু করেছি। তার জন্য ডাকখরচ সহ বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ২২০.০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে আমাদের জানাবেন। গ্রাহকরা অতি অবশ্যই তাঁদের নাম, ঠিকানা, ফোন নং এবং ই-মেইল আই-ডি জানাবেন। তাহলে আমরা আপনাদের পত্রিকা স্পিড পোস্টে পাঠিয়ে দেবো।

— পরিচালকমণ্ডলী

তামার বালায় বাত সারে?

প্রবীর ব্যানার্জী

তখন আশির দশকের শেষ। আমরা সবে বিজ্ঞান আন্দোলনে পা রাখছি। আজকের প্রবীণ মানুষেরা তখন তরতাজা নবীন। যাই হোক শশীভূষণ দে স্ট্রীটের একটা অফিসে একজন ডাক্তারবাবু গ্রামীণ ডাক্তারদের কিছু ক্লাস নিতেন। আমরা অপেক্ষা করতাম। তারপর আমাদের বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের বিষয়ক আলোচনা শুরু হত। সেই হিসেবে ডাক্তারবাবুর সাথে আমাদের একটা বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ডাক্তারবাবুও আমাদের আলোচনা শুনতেন। আমাদের একটা আলোচনা চলছে যে, ম্যাগনেটিক (চৌম্বক পদার্থ) জিনিস পরে আদৌ কোনো লাভ হয় কিনা? ডাক্তারবাবু বললেন দেখ এমনিতে তো কোনো লাভ হয় না। তবে আমি ভাবছি আমাদের রক্তের হিমোগ্লোবিনেও তো লোহা আছে যদি তার উপর কোনো প্রভাব পড়ে। তখন আমরা সেই গ্রুপের পক্ষ থেকে ডাক্তারবাবুকে প্রায় চেপে ধরলাম, 'আরে, ডাক্তারবাবু আপনি কি যে বলেন, ওখানে তো লোহা কম্পাউন্ড ফর্মে থাকে। তাহলে কিভাবে চুম্বক কাজ করবে?' ডাক্তারবাবু আর এগোন নি--- বললেন হ্যাঁ, সেটাও তো ঠিকই। অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে 'অক্সি-হিমোগ্লোবিন' তৈরি হয়, সেখানে তো চুম্বকের কোনো কাজ করার কথা নয়। আমি তাহলে এতদিন ভুল জানতাম।

আসলে এই তামার বালা নিয়েও ব্যাপারটা একই। উদ্দেশ্য বাতের ব্যথা দূরীকরণ। সবাই একটু আধটু বিজ্ঞান তো জানেন। তাই বাজারে এটা চালানোর জন্য যে বৈজ্ঞানিক থিওরি লাগানো হয় তা এরকম যে, এই তামাটা পাওয়া গেছে কোনো এমন তার থেকে যার মধ্যে দিয়ে 'হাই কারেন্ট' প্রবাহিত হয়েছে বহুকাল। যার ফলে এর মধ্যে এমন একটা ক্ষমতা এসেছে (সেটা কি অবশ্য কেউ বলতে পারে না) যাতে তামার নিজস্ব গুণ পাল্টে তার মধ্যে বাত সারানোর ক্ষমতা ঢুকে পড়েছে।

দ্বিতীয় মত হল, শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি নিয়ে। মানুষের দেহে যে সমস্ত মৌল কম পরিমাণে হলেও আবশ্যিক তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামা। বালা থেকে নিশ্চয়ই তামা শোষিত হয়ে এ প্রয়োজন মেটায় এবং ঝেঁটিয়ে বিদায় করে রোগশোক। আরেকটি মতও প্রচলিত, তাদের বক্তব্য তামাকে আর্থ না করে বালা পরানো হয় বলে এটা এত উপকারী। আর্থ না করে পরলে স্পন্ডালাইটিস, স্পন্ডিলেসিস, আরর্থারাইটিস ইত্যাদি সেরে যায়।

যাদের সামান্য বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা আছে এমনকি মাধ্যমিক লেভেল পর্যন্ত যে বিজ্ঞান আছে সেই জ্ঞানে নির্ভর করে বলা যায় যে, এই কথাগুলোর সারবত্তা কিছুই নেই। প্রথম কথা তামার মধ্যে দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাতে অংশগ্রহণ করে তামার মুক্ত ইলেকট্রন। এর সাথে তামার মূল গঠন, অণু-পরমাণুর, অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। কাজেই তামার বালাতে এমন কিছু একটা পরিবর্তন হয় বলে যে দাবি করছেন, সেটা সঠিক নয়। তামার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবার সময় দুটো ঘটনা ঘটে, প্রথমত সেটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে—যেটাকে বলে তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল আর দ্বিতীয়টি হল প্রবাদী তারের চারধারে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, যেটাকে বলে তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় ফল। বাত সারানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি ব্যবহার করা হচ্ছে। আসল কথা হল তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে কোনো ঘটনাই ঘটবে না। আমরা যে তামা হাতে পরার কথা এখানে আলোচনা করছি সেটা তড়িৎবর্তনী ছিন্ন করা তামা।

দুই, বলা হচ্ছে তামার বালাতে এমন কিছু হচ্ছে যাতে তামার অ্যাবসরভড হবার বা শোষিত হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এটা পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপার। এরকমভাবে কোনো জিনিস গায়ে স্পর্শ করিয়ে রাখলেই যদি শোষিত হয়ে যেত তাহলে তো না খেয়ে তা স্পর্শ করালেই হত। দেখা যাক এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা কি বলেন? এক বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এক্সপেরিমেন্টের অ্যাকিউরেসি কত? তিনি হয়ত বলবেন শরীরের ভেতর এক গ্রামে ১০ ৯ ভাগের কম তামা শোষিত হলে তা পরীক্ষায় ধরা পড়বে। তবে? এই তবের উত্তর দেওয়া মুস্কিল।

ওষুধবিজ্ঞানে একটা কথা প্রচলিত আছে — "disease can be cured with medicine, without medicine, inspite of medicine"—অর্থাৎ ওষুধ ব্যবহার করে বা না করে রোগ সারতে পারে, এমনকি ভুল ওষুধ ব্যবহার করেও রোগ সারতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা আবিষ্কারের পূর্ববর্তী কয়েক হাজার বছরের মানুষের অস্তিত্ব একথার সত্যতা প্রমাণ দেয়। তাই চিকিৎসা ও রোগ সারার

ভেতরকার সম্পর্ক সত্যিই জটিল। রোগ আক্রমণ প্রতিরোধ করা ও অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পেছনে মানব শরীরের ভেতরে অবিরাম চলতে থাকা নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের ভূমিকা, যাকে সাধারণভাবে অনাক্রম্যতা (immunity) বলা হয়, তার ভূমিকা আজ আর আমাদের অজানা নেই। আবার কোনো ওষুধের রোগ সারানোর নির্দিষ্ট ক্ষমতার বাইরে অনির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও মনোশারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার বিশেষ ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে। এই অনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রকগুলির প্রভাবকে সম্মিলিত প্ল্যাসিবোক্রিয়া (Placebo efefct) বলা হয়।

আবারও বিজ্ঞানী প্রশ্ন করবেন, এ রোগের ওপরে তামার কোনো প্রভাব আদৌ আছে কি? যে ন্যূনতম তামা দিয়ে রোগ সারছে তার মাপজোক কিভাবে হবে? মুশকিল হচ্ছে বিজ্ঞানীকে প্রমাণ করতে দিচ্ছি— 'ঘোড়ার ডিম নেই আপনি প্রমাণ করুন'। আসলে তাবিজ, কবচ যাঁরা পরতে চান না তাদের জন্য এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা।

নৈহাটি স্টেশনে একজন হকার একটা ঔষধ বিক্রি করার সময়ে বলেছিলেন— দাদা, একটা তেলের ল্যাম্প জ্বালাতে তেলটা ভেতরে দিতে হয় নাকি পাত্রের তলায় মাখাতে হবে।

ব্যাপারটা তাই। আয়রন থেকে ক্যালসিয়াম বাজারে প্রচুর ওষুধ পাওয়া যায় ধাতুর স্বল্পতা দূর করতে। যদি তার বদলে কাউকে রেললাইনের ওপর খানিকক্ষণ শুইয়ে রাখা হয় তাহলে তার আয়রন সমস্যা মিটবে বলে মনে হয়?

তাই যে কোনো রোগ প্রতিরোধে বা দূরীকরণে আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া উচিত। উমা

কলেজের অনলাইন পঠন-পাঠন ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়ারা

শ্রীময়ী ঘোষ

দেখতে দেখতে করোনা অতিমারীর কবলে আমরা দু'বছর কাটিয়ে ফেললাম। এই অতিমারী আমাদের জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে এমন কিছু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে যার সাথে এখনও আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। পেশাগতভাবে কলেজে অধ্যাপনা করার সুবাদে আমার কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে অনলাইন পঠন-পাঠনের আবর্তে অন্তর্ভুক্ত করা। উত্তর চব্বিশ পরগণায় অবস্থিত আমার কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এক বড় অংশ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণী থেকে আসে। জীবনে সাফল্য অর্জনের স্বপ্ন নিয়ে, পরিবারের আশা-ভরসার ভবিষ্যৎ কাণ্ডারীরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয় নিয়ে এরা উদয়-অস্ত কঠোর পরিশ্রম করে লেখাপড়া চালিয়ে যায়। এই ছবি প্রতি বছর অমলিন। কিন্তু কিছু কিছু বছর এই উজ্জ্বল সংগ্রামী মুখগুলোর মধ্যে দু-একটি মুখ আরো বেশি করে চোখে পড়ে যারা সমাজে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়া হিসেবে চিহ্নিত। অতিমারীর কঠোর সময়ে আমার বিভাগের এমনই এক ছাত্রর মানসিক অবস্থা ও বাস্তবিক অভিজ্ঞতা আমায় এই ধরনের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে আরো গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করার তাগিদ অনুভব করায়। যখন এই ছাত্রটিকে অনলাইন শিক্ষা মাধ্যমে উৎসাহিত তথা অন্তর্ভুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তখন পর্যবেক্ষণ করি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষের প্রত্যক্ষ পঠন-পাঠন অর্থাৎ অফলাইন শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্র-অনুকূল কার্যকরী কিছু বৈশিষ্ট্য অনলাইন পঠন-পাঠনে প্রচ্ছন্নভাবে অনুপস্থিত যা আমার এই বিশেষ ছাত্রটির লেখাপড়া ও মানসিক স্বাস্থ্যর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এইরকম এক ছাত্রকে পড়ানোর সময় অনলাইন পঠন-পাঠনে নির্দিষ্ট যে দিকগুলির আমি হদিস পাই নি, তা হল এই লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়।

আলোচনার শুরুতেই যে প্রশ্নটি উঠে আসে, তা হল —বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়া বলতে কাদের বোঝায়? বলা যেতে পারে, যেসব পড়ুয়াদের ইন্দ্রিয় ক্ষমতা, বুদ্ধি বা শারীরিক সক্ষমতা এতটাই ভিন্ন যে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তারা হল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়া। কলেজে আমার বিভাগে কালেভদ্রে এমন কিছু পড়ুয়া ভর্তি হয়। তাদের পড়ানোর সুবাদে খেয়াল করেছি এদের বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের থেকে তুলনামূলকভাবে ধীরগতিতে হলেও জানা ও শেখার ইচ্ছে, এগিয়ে যাওয়ার উদ্যম, সামাজিকতা ও সৌজন্যবোধে বাকিদের থেকে এরা কোনো অংশে কম নয়। এই ধরনের পড়ুয়াদের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কলেজে শিক্ষাদান করার প্রধান উদ্দেশ্য হল তাদের 'ইনক্লুসিভ এডুকেশন'-এর মধ্যে সামিল করা। এর ফলে, তারা বাকিদের মতন শিক্ষালাভ

করার সমান সুযোগ-সুবিধে যেমন পাবে, একইসাথে পাবে সমান সামাজিক স্বীকৃতি। এককথায়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রধান কারণ হল তাদের জীবনের প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে যথাযথ সার্বিক (বৌদ্ধিক, শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক) বিকাশ সাধনের জন্য অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একইরকম শিক্ষামূলক ও সামাজিক পরিবেশে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। অতিমারীর সময়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের সমস্যা নিয়ে যাবতীয় আলোচনা আবর্তিত হয়েছে স্কুলপড়ুয়াদের ঘিরে। তুলনামূলকভাবে, কলেজের প্রাপ্তবয়স্ক এই ধরনের পড়ুয়াদের হালহকিকত সেভাবে আলোচনার পরিসরে আসে নি। একথা অনস্বীকার্য যে স্কুল হোক বা কলেজ পড়ুয়া—লকডাউনের সময়ে এই বিশেষ পড়ুয়াদের এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে যা অভিন্ন। এই প্রসঙ্গে ২০২১ সালে প্রকাশিত প্রতীচি ট্রাস্টের প্রতিবেদন, 'Breaking Barriers: AShort Report on Deschooling of Children with Special Needs during the Pandemic' উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে অতিমারীর সময়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বাচ্চারা করুণ অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করেছে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে বাড়িতে তাদের যে বন্দীদশা হয়েছিল তা নানাভাবে তাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। এই সময়ে তারা চরম অবহেলার শিকার হয়েছে কারণ পরিবার ও সমাজ, দুক্ষেত্রেই তাদের মৌলিক চাহিদা এবং অধিকার কারোর কাছে গুরুত্ব পায় নি। লকডাউনের সময়ে এইসব বাচ্চাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য পারিবারিক বাধ্যবাধকতা, অন্যভাবে বললে, সাংসারিক চাপে হারিয়ে গেছে।

অনলাইন পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হাজার হাজার গরীব ছাত্র-ছাত্রী মাসের পর মাস, এই দু'বছর ধরে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তা হল পড়াশোনা করার জন্য একটি কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের অভাব। এই একই সমস্যার শিকার হয়েছে আমার বিভাগের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রটিও। দাদা-বৌদিদের অস্বচ্ছল সংসারে বসবাসকারী এই ছাত্রর কাছে নিজস্ব স্মার্টফোন এক বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। অনলাইন ক্লাসে তার অনুপস্থিতি দেখে টেলিফোনের মাধ্যমে যখন যোগাযোগ করি, ছাত্রর পরিবর্তে, তার দাদার সাথে কথা হয়। জানতে পারি, কর্মসূত্রে মাঝেমধ্যে তিনি অন্যত্র থাকেন। তখন তার কাছেই পরিবারের একমাত্র স্মার্টফোনটি থাকে। সে কারণে আমার ছাত্রর পক্ষে অনলাইন ক্লাস করা সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে যেটা বুঝতে অসুবিধে হল না তা হল, আমার ছাত্রর পক্ষে স্বাধীনভাবে কলেজের কারো সাথে যোগাযোগ করা অসম্ভব। যোগাযোগের জন্য তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় পরিবারের সময়-সুবিধের ওপর। তাই খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যখন ফোনের মাধ্যমে তার সাথে কথা বলতাম, তার কণ্ঠস্বর শুনে সহজেই এক অসহায়তা অনুমান করতে পারতাম। বুঝতে পারতাম, কলেজ জীবনের সাথে তার একটা বেদনাদায়ক দূরত্ব তৈরি হয়েছে যা অতিক্রম করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। এর ফলে, একাধারে বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে যেমন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে, জন্ম নিচ্ছে পড়াশোনার প্রতি অনীহা। যখন জিজ্ঞাসা করতাম, 'কেমন আছ?' এক মুহূর্তে উত্তর পেতাম, 'ভালো না। বন্ধুদের সাথে দেখা হয় না, কথা হয় না, খুব মন খারাপ।' অস্বীকার করব না তার এই মন খারাপ আমাকেও সংক্রামিত করত। তখন বুঝতে পারতাম, করোনা পূর্ববর্তী সময়ে কলেজে সে যেভাবে আনন্দের সাথে পড়াশোনা করত, বন্ধুদের সাথে হৈহৈ করে কাটাত, প্রতিনিয়ত সেসবের অভাব বোধ করছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই অভাব মেটানো এবং বিকল্প কোনো ইতিবাচক সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে তার বিষণ্ণতা দূর করার কোনো উপায় তার পরিবারের তরফ থেকে হয়েছে বলে শুনিনি। এক্ষেত্রে অবশ্যই বুঝতে পারছিলাম তার পরিবারের নিরুপায় অবস্থা। অতিমারীর দাপট, কাজের অভাবে যখন অস্বচ্ছল পরিবারগুলিকে অন্নসংস্থানের জন্য প্রাণপণ লড়াই করতে হচ্ছিল, তাদের কাছে তখন পরিবারের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সদস্যর মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখার মতন সামর্থ্য ছিল না। শুধুমাত্র আর্থিক নয়, শিক্ষাগত বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ এই বিশেষ পড়ুয়াদের চাহিদা, অবসাদ ও মনন বোঝার মতন মানসিকতা সব পরিবারে থাকে না। প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাঙ্ক ২০২০-র প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাপী এক বাস্তব ছবি তুলে ধরেছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো এবং শিক্ষাগত মানের ওপর নির্ভর করে একজন পড়ুয়া অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার জন্য কতটা পারিবারিক সমর্থন পাচ্ছে।

অনলাইন পঠন-পাঠনের পক্ষে একটি জোরালো যুক্তি হল পড়ুয়ারা বাড়িতে আরামে পড়াশোনার সুযোগ পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার কষ্ট ও যাতায়াতের জন্য ব্যয় করতে হয়

না। এই যুক্তি দুর্বল প্রমাণিত হয় যদি শিক্ষা অর্জনের উপযুক্ত পরিবেশের প্রশ্নটি এখানে বিচার করি। অনলাইন ক্লাস নেওয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী হামেশাই ক্লাসে আসতে পারত না কারণ তাদের পক্ষে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য নিয়মিত ব্যয় করা সম্ভব হত না। তাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারি, কলেজে এলে তারা একদিনে একাধিক অফলাইন ক্লাস করতে পারে। কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগের জন্য তারা যেহেতু বেশি ব্যয় করার মতন আর্থিক অবস্থাপন্ন নয়, তাই তাদের অনলাইন ক্লাস দু-তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। আমার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রটি তাই কিঞ্চিত-কদাচিত অনলাইন ক্লাসে আসত। ক্লাসে তার উপস্থিতি চাক্ষুষ করে অনলাইন পঠন-পাঠনের আর একটি নেতিবাচক দিক উঠে এল যার কোনো সমাধান নেই। ভিডিও সক্রিয় রেখে যখন ছাত্র ক্লাস করত, দেখা যেত, সে বাড়ির উঠোনে বা বাড়ি থেকে একটু দূরে বসে ক্লাস করছে। দেখতাম, আশপাশে পরিবারের অন্য সদস্যরাও কাজে ব্যস্ত, নিজেদের মধ্যে তাঁরা উচ্চস্বরে কথা বলছেন যা কখনো কখনো ক্লাস নেওয়ার সময়ে মনসংযোগে বিঘ্ন ঘটায়। এ থেকে একটি বিষয়ে অবগত হওয়া যায় যে, ছাত্রটির বাড়ির পরিবেশ অনলাইন পাঠের জন্য অনুপযুক্ত। বাড়িতে বসে আরামে অনলাইন পড়াশোনার যে দাবি করা হয়ে থাকে তা কেবলমাত্র সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যাদের বাড়িতে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনার করার জন্য পর্যাপ্ত কাঠামো ও পরিবেশ আছে। সে অর্থে বলা যায় যে, অনলাইন পাঠের সংকীর্ণ এক শ্রেণী চরিত্র দৃশ্যমান যার ফলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রটির মতন যারা আর্থিক, সামাজিক, দৈহিক, মানসিক দিক থেকে সমাজে দুর্বল ও অবহেলিত, তারা সহজে এর আওতায় ঠাঁই পায় না।

অতিমারীর সময়ে যতই অনলাইন পঠন-পাঠনের অপরিহার্যতা মেনে নিই না কেন, একথা ভালোই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ধারার শিক্ষা অফলাইনে ক্লাসরুমে পড়াশোনার যথার্থ বিকল্প হয়ে উঠতে পারে না। এর কারণ হল মানবিকতার সূক্ষ্ম ছোঁয়া যা অফলাইন ক্লাসের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খুব সহজে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সাধারণ আচরণ, কথোপকথন বা দৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে দিতে পারেন, কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের স্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে সেই আত্মিক সংযোগ স্থাপন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য, স্বীকৃতি অর্জনের জন্য যাকে অজীবন লড়াই করে যেতে হচ্ছে, তার অদম্য জীবনীশক্তি, হার-না-মানা মানসিকতাকে আরো উজ্জীবিত ও দৃঢ় করা একজন শিক্ষিকা হিসেবে মৌলিক নৈতিক পেশাগত দায়িত্ব বলে মনে হয়। অফলাইন ক্লাসে লেখাপড়ার সামান্য প্রশংসা বা প্রচেষ্টার পক্ষে সমর্থনসূচক স্নেহের স্পর্শ এবং তার প্রতি যত্নশীল দৃষ্টিপাত করলে দেখা যেত তার আত্মবিশ্বাস, জীবন জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার এক প্রত্যয় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেটির চোখেমুখে ফুটে উঠত। বিশেষ করে, লকডাউনের সময়ে তাকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য টেলিফোনের মাধ্যমে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে বোঝা যেত সামনাসামনি না বসে, না দেখে, শুধুমাত্র একজনের কণ্ঠস্বর শুনে কারও মনের অবস্থা আন্দাজ করা খুব কঠিন কাজ। তার থেকেও কঠিন কাজ মৌখিকভাবে উজ্জীবিত করা যাতে সে অবসাদের গহ্বরে হারিয়ে না যায়। অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক এই দিকগুলির কিভাবে যত্ন নেওয়া যায়, সেটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

একটা বিষয় দেখা যায় যে আনন্দ ও স্বস্তির বার্তা বহন করে তা হল, প্রান্তিক শ্রেণীভুক্ত পড়ুয়ারা কলেজের পরিবেশে নিজেদের নিজস্বতা, সৃজনশীলতা, বন্ধুদের সাথে আনন্দে এক অন্য জগৎ খুঁজে পায়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রটি প্রাণ খুলে সহপাঠীদের সাথে কলেজ জীবন উপভোগ করছে। করোনার গ্রাসে প্রাণোচ্ছল কলেজ জীবন যখন তার হারিয়ে যেতে লাগল, দুশিন্তা ও ভয় হত যে তার এই এগিয়ে চলা থেমে যাবে না তো? স্বস্তিদায়ক বিষয় হল, সম্প্রতি অফলাইন শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যাবর্তন হয়েছে। এই ছাত্রটির কাছে এটা শুধু অনলাইনের যন্ত্র-নির্ভর পড়াশোনা থেকে মুক্তি নয়, তার থেকেও বড় পাওনা কলেজে মুক্ত জীবনের খোলা হাওয়ায় প্রাণ খুলে বিচরণ করার আনন্দ ফিরে পাওয়া। অনলাইন পঠন-পাঠনের প্রয়োজন ছিল ঠিকই কিন্তু মন ও মননের গভীরতা সেখানে অধরা।

তথ্যসূচিঃ Pratichi Institute (India) Trust (2021). Breaking Barriers : A Short Report on Deschooling of Children with Special Needs during the Pandemic.

Yazcayir, G., Gurgor, H. (2021). Students with Special Needs in Digital Classrooms during the COVID-19 Pandemic in Turkey. Pedagogical Research, 6 (1), em0088.

উমা

আর্থিক উন্নয়ন ও হাট ঃ একটি অন্য প্রসঙ্গ

শুভঙ্কর রায়

আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা এবং অর্থনৈতিক সংকট মানব সমাজে যেন এক বৈশ্বিক ব্যাপার (global affair)। বিশ্বায়নের যুগে প্রায় সর্বত্রই এটি একটি বহুচর্চিত বিষয়। উল্টোদিকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করতে দেশীয় 'বাজার নিয়ন্ত্রণের' রীতি আমাদের কারোরই অজানা নয়। এর প্রভাব স্থানীয় হাট ও বাজারগুলির উপরেও পড়ে। তবে বিগত প্রায় এক শতাব্দী ধরে বহু চেষ্টা করে মানবজাতির ইতিহাস চর্চায় বাজারের সম্পর্ককে অর্থনীতিকেন্দ্রিক জটিলতার বাইরে বেরিয়ে বিভিন্ন সমাজের লোকাচারের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন — আশির দশকে Akos Ostor, একজন হাঙ্গেরিয়ান নৃতত্ত্ববিদ, বাজারকে 'place, a kind of activity, a living reality, a cultural form and set of indigenous categories...exchange, kinship and categories such as ability, thought and power'-এর জায়গা থেকে তুলে ধরেছেন। এই সন্দর্ভটি নিঃসন্দেহে হাটের আলোচনায় আমাদের উৎসাহ যোগাবে।

হাট কেবল ব্যবসার ক্ষেত্র বলে ধরা যায় না, এটি গ্রামীণ সংস্কৃতির অঙ্গ। টাকাপয়সা দিয়ে লেনদেনের বাইরেও জিনিসপত্র বিনিময়ের রীতি একসময় আমাদের তথাকথিত গ্রামীণ হাটগুলিতে লক্ষ্য করা যেত। সামনেই উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সীমান্তে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে এখনো এই রীতির চল আছে। সুতরাং, এই ধরনের বিনিময় প্রথাকে পশ্চিমীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আগেভাগেই অতি প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, বিলুপ্তপ্রায় ধরে নেওয়ার কোনো মানে হয় না। চারিদিকে কান পাতলেই শোনা যায় গ্রামে-গঞ্জে দোকানপাট, এমনকি জেলাভিত্তিক ছোটো ছোটো হাটের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। তবে এই দিকেও সমস্যা। এটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণ হিসাবে ধরা যাবে না জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা—সেই প্রশ্নটি থেকেই যায়। তাছাড়া হাট সাপ্তাহিক বাজারে পরিণত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টিও লক্ষণীয়। এমনকি ইদানীং নতুন কিছু হাট তৈরি হলেও কিছুদিন পরে হাটগুলোর জৌলুস হারিয়ে যাচ্ছে। মেখলিগঞ্জে নতুন হাটের মারফত কৃষি বাজার তৈরির পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন মাটিগাড়া হাটের (জোত নং-১০২) কথায় যদি আসি, এটি উত্তরবঙ্গের সব থেকে বড় হাট হিসাবে পরিচিত। ব্রিটিশদের আমল থেকেই এই হাট বেঁচে রয়েছে। তার পাশেই খাপরুল হাটের অস্তিত্ব এখন আর নেই। এই পরিস্থিতিতে হাটের মৌলিক সম্পর্ককে সামনে রেখে মাটিগাড়া হাটের কথায় বিস্তারিতভাবে আসব।

হাট মূলত ক্রেতা-বিক্রেতা ও সাধারণ লোকজনের আন্তরিকতার মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়াকে মজবুত করে। বাণিজ্যমুখী হওয়ার থেকেও ঋতু অনুযায়ী সংলগ্ন জনসমষ্টিগুলির মধ্যে খাদ্যদ্রব্যসামগ্রী ও ব্যবহারিক জীবনের নানান জিনিসপত্রের বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে স্থানিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। মাটিগাড়া সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে হাট করতে এসে পরস্পরকে দেখা, খোঁজ নেওয়া, বিনিময় করা, নিয়ন্ত্রক বাজার মূল্যের (রেগুলেটরি মার্কেট প্রাইস) হিসাবের বাইরে দর কষাকষির ছলনায় নগদ লেনদেন করা ইত্যাদি এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। বাজার নিয়ন্ত্রণের নিরিখে মানবজাতির ইতিহাস চর্চায় হাটের এই আত্মীয়তার সম্পর্ক যার চর্চা অতি প্রয়োজন।

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি জেলায় পুরাকালে হাট স্থাপন রাজাদের ধর্মীয় আচরণবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হত। চণ্ডীদাস লাহিড়ীর মতে, 'ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাজারের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈনিক বাজারগুলি ছাড়া তাদের পরিপূরক হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সাপ্তাহিক হাট ও বাৎসরিক গ্রামীণ মেলাগুলি। তবে ব্রিটিশ প্রবর্তিত দার্জিলিং ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড পরিচালিত হাটগুলি এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী হাটগুলি থেকে অনেকটাই আলাদা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঔপনিবেশিক ব্যবসার সুবিধার্থে হাটগুলিকে বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত দার্জিলিং জেলা উন্নয়ন তহবিলের পরিকল্পনায়, মাটিগাড়ায় হাটের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরির প্রচেষ্টা এবং বৈদেশিক আমদানি রপ্তানির সম্প্রসারণ হাটকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পর্যায়ে পরিণত করেছিল। যেমন হাটে আনীত দ্রব্যগুলো 'স্পেশাল ক্লাস', 'ফার্স্ট ক্লাস', 'সেকেন্ড ক্লাস' স্টল অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছিল। তার মধ্যে স্পেশাল ক্লাসে সোনা, রূপা, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু, অলঙ্কার, পশমি কাপড়, তসরের জামা, তুলা, পান, সিগারেট, দেশলাই বাক্স, বই, পাণ্ডুলিপি,

সুগন্ধি, সাবান ইত্যাদি, ফার্স্ট ক্লাসে ধান, চাল, চিনি, গুড়, ডাল, চিঁড়ে, মুড়ি, দর্জির দোকান, চা, অভিনব মাটির পাত্র, শুকনো ফল, সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়, তামাক, মশলা, কাঁচের জিনিসপত্র, ওষুধ, কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, দুধ, শুকনো মাছ, কামারের দোকান, নাপিতের দোকান, মহাজনের কারবারি ইত্যাদি। সেকেন্ড ক্লাসে মাটির হাঁড়ি, মাংস, ভারতীয় ভুট্টা, কাঠের পণ্য, চিরতা, কাঠকয়লা, লবণ, কৃষি উপকরণ, বেত এবং বাঁশের জিনিসপত্র ইত্যাদি এবং থার্ড ক্লাসে সব ধরনের সবজি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যবহারের নির্দেশ ছিল। এ ছাড়া হাটে গবাদি পশু নিয়ে আসার জন্য হাট বাসও চালু করা হয়েছিল।

আঞ্চলিকতার দিক থেকে ধরলে এই হাট গ্রামীণ সংস্কৃতির মৌলিকতাকে ছাড়িয়ে রাজনৈতিক স্তরে দার্জিলিং পাহাড় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও সিকিমের রাজা ফুন্টসোগ নামগ্যালের মধ্যে রাজকীয় বিনিময়ে উপকরণ হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৯-১৮৪৯-এর মধ্যবর্তী সময়ে ড. ক্যাম্পবেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ও বৈদেশিক আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর মূলত নেপাল, ভুটান, সিকিমের কিছু প্রজাদের নিয়ে তরাই অঞ্চলে নতুন লোকালয়ের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে খোলা বাজার তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলত এই দশ বছরের মধ্যেই জোত সংখ্যা ৫৪৪ হয়ে যায়। ১৮৫৩-১৯২৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে ৮৬০-এ পৌঁছায়। এর পাশাপাশি ২২টি হাটও স্থাপন করা হয়। তবে এই হাটগুলোর মূল উদ্দেশ্য বিক্ষিপ্ত জনপদগুলোর মধ্যে ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপন করা। হাটগুলো মৌজাতে পরিণত হয়। ব্রিটিশদের এই ধরনের বাণিজ্যের প্রচলন স্থানীয় জনপদগুলো এবং অভিবাসিত জনসমূহের মধ্যে ভিন্ন জাতিগত বিনিময়ের প্রক্রিয়া শুরু করে। এটি এক ধরনের সংস্কৃতি যা হাটকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে।

এই সংস্কৃতির ধরন মাটিগাড়া সংলগ্ন শিলিগুড়ি শহরের অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত বিকাশের পরিকল্পনার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যা হ্রাসের মতো বিজ্ঞাপনের চমককে সামনে রেখে নতুন টাউনশিপ, কলোনি, প্রাইভেট নার্সিং হোম, কৃষি জমির পরিবর্তে চা-বাগান, ফ্লাইওভার, জাতীয় সড়ক নির্মাণ। তবে এক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ স্বাভাবিক জন্ম হার, মৃত্যু হার, উর্বরতার হার, মরণশীলতা পরিমাপের থেকেও ট্রাফিক জাম, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, বাজারের ভিড়, অন্ধকার এবং বিপদজনক অঞ্চল ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। ফলত এই রূপে শহরিকরণের সাথে যুক্ত হওয়ায় মাটিগাড়া হাট অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া শপিং মল গজিয়ে ওঠার ফলে হাট-বাজার বেশ বিপদের মুখে। হাট খোলার পুনর্গঠন, পুনর্বাসন, জেলা ভিত্তিক নতুন হাট বসানো, দোকানের জন্য স্থায়ী ভবন এবং স্থায়ী মান্ডি তৈরি ইত্যাদি পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের পরিকল্পনা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিপূরক হয়ে উঠলেও হাটের সম্পর্ক এক্ষেত্রে 'ল্যান্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট'-এর সাথে যুক্ত হয়েছে। তাই সরকার হাটকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে হয়ত হাটগুলি অক্সিজেন পাবে।

সূত্র ঃ

১.Ostor Akos, 'Anthropology or Marxist Straight-Jacket?' in Economic and Political Weekly, XXII (23), 1987.

২. মজুমদার, মানস, চরাই হাট, দধাই হাট— বাংলার হাট, বাংলা হাট সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতির মননশীল ত্রৈমাসিক, বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা, ৩৫, কলকাতা বইমেলা, ২০০২

৩. Das, Chandi Lahiri, Trade and Commerce of Jalpaiguri, 173, Special Issue Jalpaiguri District, Madhuparni Patrika, 2009.

৪. Sharma, Umesh. A historical light through the ages of the Poojas, Parvans and Customary rituals of Baikunthapur (Jalpaiguri) as part of the culture of ab-original people North Bengal, 68, Kolkata: Boiwala, 2009.

৫. Report on an enquiry into the working of the Darjeeling Improvement Fund and Suggestion for In-creasing its Income, Part I Report, 1941, Govt. of Bengal, Revenue Deptt., (Alipore: Bengal Govt. Press)

৬. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সময়ের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে উত্তরের ঐতিহ্য হাট-বাস, শিলিগুড়ি ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮।

৭. Jurisdiction List of Police Stations of District Darjeeling 1921-24 & 1956-65, Directorate of Land Records & surveya, W.B.

৮. Dash, Aurher Jule. Darjeeling District Gazetteer, Alipore:Bengal Govt. Press, p.49, 1947.

৯. Perspective Plan 2025 Siliguri Jalpaiguri Planning Area, SJDA, Vol.II Proposals.

১০. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, উত্তরবঙ্গের সব হাট আধুনিক করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, ২৯ ডিসেম্বর, শিলিগুড়ি।

উমা

পুস্তক পর্যালোচনা

‘বিবলিওথেরাপি’ বা ‘বই-চিকিৎসা’ নিয়ে বাংলাভাষায় প্রথম বই!

বই যখন ওষুধের কাজ করে ঃ সুরেশ কুণ্ডু

প্রকাশক — প্রিন্ট ও বুকস, ৩৪ বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা —৭০০০০৯; মূল্য - ১০০ টাকা।

‘বিবলিওথেরাপি’ বা ‘বই-চিকিৎসা’ অর্থাৎ শুধু বই দিয়ে নানা রোগের চিকিৎসার ব্যাপারটি আমাদের আমাদের এখানে খুবই কম পরিচিত। চিকিৎসা মানেই ওষুধ বা অস্ত্রোপচার —এগুলিই প্রচলিত। কিন্তু বই দিয়েও যে নানা রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা কষ্ট লাঘব করা যায় এটি সাধারণ মানুষ বিশ্বাসই করবেন না। তাই আমাদের দেশের সব বড় বড় সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে মন্দির মসজিদ গির্জার উপস্থিতি থাকেই, কিন্তু শুধু রোগীদের পড়ার ও চিকিৎসার জন্য গ্রন্থাগার নেই বললেই চলে। বাইরের অনেক দেশে কিন্তু ছবিটা এমন নয়। আমাদের দেশে শিক্ষার হার কম হওয়াটাও এর বড় কারণ। তবে এর ফলে আমাদের এখানেও ‘বিবলিওথেরাপি’-র গুরুত্ব আদৌ কমে না। বিশেষত যখন যে সব রোগের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা বিশেষভাবে কার্যকরী, ঐ সব রোগের প্রকোপ বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের দেশেও ক্রমবর্ধমান।

লেখক শ্রী সুরেশ কুণ্ডু এমন একটি অনালোকিত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ও বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তা তুলে ধরেছেন। তিনি বই-চিকিৎসার ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানিয়েছেন প্রাচীন মিশর ও রোমে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে চিকিৎসার চেষ্টা করা হত। আবার সব শেষে দিয়েছেন ব্রাসেলস-এর ফ্রি ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণার খবর। এটিতে জানানো হয়েছে, উনিশ শতক থেকে মানুষের বুদ্ধিশক্তি কমছে। আর তার পেছনে অন্যতম বড় কারণ হল বিপুল পরিমাণ ওষুধের ব্যবহারের সঙ্গে সম্প্রতিকালে সোশ্যাল মিডিয়ার সর্বক্ষণের ব্যবহারে ব্যবহারকারীর আলস্যের বৃদ্ধি। আর এর সমাধানে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার কমিয়ে বইপড়ার ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। আর শুধু এই বুদ্ধিশক্তি তথা মৌলিক চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা উন্নত করার ক্ষেত্রে নয়, দেখা গেছে, বেশ কিছু ‘মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি’র ক্ষেত্রেও বই দিয়ে চিকিৎসা কার্যকরী যেমন অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার, বুলিমিয়া নার্ভোসা, যৌন অক্ষমতা, অ্যালকোহল আসক্তি, আবেগগত বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে টিভি-মোবাইলের পরিবর্তনশীল আলোর মুখোমুখি বসে দীর্ঘক্ষণ কাটালে মস্তিষ্ক-চোখ-কান যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বইয়ের ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা নেই। বরং বইপড়ার ফলে মস্তিষ্ক তথা মস্তিষ্ক কোষের ব্যায়াম হয় এবং তার কাজের উন্নতি ঘটে।

এই ধরনের নানা ক্ষেত্রের নিরাময়ের ও উপশমের সঙ্গে সঙ্গে বই মানুষের সত্যিকারের উপকারি বন্ধুর ভূমিকা পালন করে। যেমন—নিঃসঙ্গ মানুষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষ, পারিবারিক হিংসার শিকার হওয়ার পর ও হতাশাগ্রস্ত লোকজন, নেশা ছাড়ার পর মানসিক ও শারীরিকভাবে অস্থির অবস্থায় ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে বন্ধু হিসেবে বই নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

বই নিয়ে এই ধরনের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে। বাংলাভাষায় এই বিষয় নিয়ে বইয়ের অভাব দূর করেছে এটি। তবে বইটির প্রতি পাতা দৃষ্টিকটুভাবে শুধু ইংরেজি অক্ষরে নানা ইংরেজি প্রতিশব্দ, উদ্ধৃতি, রোগের নাম ইত্যাদিতে ভর্তি। বাংলা হরফে সেগুলির উচ্চারণ দেওয়া হয় নি। এমনকি ‘বিবলিওথেরাপি’ এই কথাটিরও। তাই যে সব পাঠক ইংরেজি পড়তে বা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন না, তাঁদের কাছে ঐ অংশগুলি অন্ধকার। ঐ সব নামগুলি তাঁরা জানতেও পারবেন না। মনে হয় বাংলা ভাষায় লেখা বইতে যে সব ইংরেজি বা বিদেশী শব্দের বাংলা অনুবাদ করা সম্ভব হয় নি, সেগুলি বাংলা ও ইংরেজি দুটি হরফেই দেওয়া উচিত। আর ইংরেজি উদ্ধৃতির যথাসম্ভব বাংলা অনুবাদ দেওয়া দরকার। এছাড়া কিছু কিছু রোগের নামের বাংলা অনুবাদ যা করা হয়েছে তাও আরো একটু ভালোভাবে করা যেত। যেগুলির ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব নয়, বাংলায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া যায়। যেমন ‘অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার’-কে ‘বাধ্যবাধকতা জনিত সমস্যা’ ঠিক বলা যায় না।

যাই হোক এ ধরনের দু’একটি বিষয় সত্ত্বেও বইটির গুরুত্ব আদৌ কমে না। ‘বিবলিওথেরাপি’ তথা বই-চিকিৎসা নিয়ে বাংলা ভাষায় সম্ভবত প্রথম এই বইটি উপস্থাপনা করার জন্য দীর্ঘদিনের বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম কর্মী শ্রী সুরেশ কুণ্ড আমাদের ধন্যবাদার্হ। বিষয়টির আরো প্রচার এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কাম্য।

—ভবানীপ্রসাদ সাহু উমা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 40.00
৪৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ৪০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — ৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়। স্পিড পোস্টে নিলে ২২০ টাকা জমা দিতে হবে।

Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0058400

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	২৫০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১০০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক: রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু: হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা, দুপুর ৩টে-সন্ধ্যে ৭টা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। **হারিত বুকস (অনলাইন) haritbooks@gmail.com**
উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।